জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

১০ই নভেম্বর, ১৯৮৩ স্মরণে বিশেষ সংখ্যা

বুলেটিন নং ১৮, ৪র্থ বর্ষ, বৃহস্পতিবার, ১০ই নভেম্বর, ১৯৯৪

মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা

জন্ম: ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯'

মৃত্যু: ১০ই নভেম্বর, ১৯৮৩

তোমাদের অমর আত্মত্যাগই আমাদের প্রেরণার উৎস

শহীদ জগবন্ধু চাকমা (পোলো)

শহীদ পূর্ণেন্দু চাকমা (বাবু)

শহীদ সুধাকর চাকমা (সুবোধ)

সম্পাদকীয়

জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে মহান শহীদদের গৌরবময় আত্মোৎসর্গের মহিমা নিয়ে ১০ই নভেম্বর'৯৪ আমাদের মাঝে উদ্ভাসিত হলো। এদিন সকল জুম্ম জনগণ পালন করছে জাতীয় শহীদ দিবস ও জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার একাদশতম মৃত্যু বার্ষিকী। জন সংহতি সমিতিও আজ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে সর্বত্যাগী প্রয়াত নেতা সহ অন্যান্য বিপ্লবী ও দেশপ্রেমিকদের অবদানের কথা যাঁরা জন্মভূমি ও জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে অকাতরে জীবন উৎসর্গ করেছেন; আর সমবেদনা ও সহানুভূতি জানাচ্ছে সকল শহীদের শোকসন্তপ্ত আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি। একই সাথে সমবেদনা জ্ঞাপন করছে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রামে পঙ্গু হয়ে যাঁরা দুর্বিসহ জীবন যাপন করছে এবং শত্রুর কারাগারে ও বন্দীশালায় যাঁরা মৃত্যুর প্রহর গুণছে তাঁদের সকলের প্রতি।

অধিকার কেউ কাউকে দেয় না, অধিকার আদায় করতে হয়। এই অমোঘ সত্যে উদ্বুদ্ধ আত্মত্যাগী বীর শহীদরা আজ আমাদের মাঝে নেই। জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রামে তারা নিজেদের যৌবন জীবন দিয়ে এঁকে দিয়েছে জাতীয় মুক্তির নিশানের আল্পনা। আর দেশপ্রেমিক জুম্ম জনতাকে দিয়েছে এগিয়ে চলার এক রক্তাক্ত পিচ্ছিল পথের অনুসন্ধান। সেই মহান নেতা ও বীর জুম্মদের আত্মত্যাগের নীতি-আদর্শে অনুপ্রাণিত মুক্তিপাগল জুম্ম ছাত্র-শিক্ষক-জনতা আজ দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। সুদীর্ঘ ২২ বৎসরের সংগ্রামে এ পর্যন্ত ১৮৬ জন পার্টি সদস্য মুক্তি সংগ্রামে শহীদ হয়েছেন। শত্রুসেনা ও নরপিশাচদের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন শত শত জুম্ম নরনারী। শত শত জুম্ম নারী হয়েছে লাঞ্ছিতা, হাজার হাজার পরিবার আজ স্বদেশে গৃহহারা উদ্বাস্তু। পঞ্চাশ হাজারের অধিক বিতাড়িত জুম্ম নরনারী এখনও বিদেশের মাটিতে আশ্রিত। কিন্তু তা সত্বেও জুম্ম জনগণের এই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন থেমে থাকেনি। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে। জয় আমাদের নিশ্চিত। শহীদের রক্ত বৃথা যাবে না। আজকের ১০ই নভেম্বর আমাদেরকে পুনরায় সেকথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

প্রতি বছর ১০ই নভেম্বর স্মরণ করে দেয় অমর শহীদদের আত্মত্যাগের মহিমাকে। দেশ ও জাতির জন্য তাঁদের আত্মত্যাগের কোন তুলনা নেই। এই ত্যাগ তাঁদেরকে করেছে অমর। তাঁরা ছিল জাতীয় অস্তিত্বের প্রশ্নে আপোষহীন সংগ্রামী, জুম্ম জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বিজাতীয় আগ্রাসনকে করেছে প্রতিহত। ঘুণেধরা সমাজের সকল আবর্জনা মুছে নূতন জুম্ম সমাজ গঠনে তাঁরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল, সমাজের সকল অন্যায়-অবিচার ও নিপীড়নের প্রতিবাদ করেছিল। তাই তাঁরা বর্তমান প্রজন্মের কাছে যেমন অনুসরণীয়, তেমনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছেও হবে পূজনীয়। জুম্ম জাতীয় ইতিহাসে তাঁদের অবদান স্বর্ণাক্ষরে খোদিত থাকবে।

১০ই নভেম্বর '৮৩ এর এই দিনে বিশ্বাসঘাতক চার কুচক্রী গিরি (ভবতোষ), প্রকাশ (প্রীতি কুমার), দেবেন (দেবজ্যোতি), পলাশ (ত্রিভঙ্গিল) এর ষড়যন্ত্রমূলক এক বর্বরোচিত হামলায় হত্যা করে জুম্ম জাতির মহান প্রবক্তা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাসহ দেশপ্রেমিক সংগ্রামী শুভেন্দু, জুনি, মিশুক, রিপন, স্বাগত, অর্জুন ও সৌমিত্রকে। এই হত্যালীলা ও বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়ে নূতন করে সূচিত হয় অবাঞ্ছিত গৃহযুদ্ধ—গৃহযুদ্ধের অন্তিম অধ্যায়। ফলতঃ জাতীয় জীবনে নেমে আসে চরম দুর্যোগ ও বিপর্যয়। জাতীয় বেইমান ও ক্ষমতালোভী চার কুচক্রীদের দ্বারা হত্যা, নির্যাতন, লুন্ঠন শুরু হয় নিভৃত গ্রামে। এই দিনে উচ্চাবিলাসী গিরি-প্রকাশ দেবেন-পলাশ চক্র নিজেদের দুর্নীতি, বাণিভচার ও অপবাদ ঢাকার উদ্দেশ্যে পার্টির সর্বময় ক্ষমতা দখলের হীনতম ষড়যন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। এটা ছিল জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার এক হীন ষড়যন্ত্র। এভাবে

তারা রচনা করে জুম্ম জাতির ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়। মহান নেতা ও দেশপ্রেমিকদের মৃত্যুতে সারা জাতি শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। ১০ই নভেম্বর পরিণত হয় জাতীয় শোক দিবসে।

জুম্ম জাতির জীবন থেকে এই শহীদ দিবসের কালো ছায়া যেমন মুছে যায়নি, তেমনি চার কুচক্রী তথা প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদীদের ষড়যন্ত্রের এখনও শেষ হয়নি। দেশ বিদেশে এই কুলাঙ্গারদের হীন তৎপরতা এখনও অব্যাহত রয়েছে। উগ্র ঐসলামিক সম্প্রসারণবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ক্রীড়নক হয়ে এই বিশ্বাসঘাতকরা হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। আজ তার আগ্রাসী বাহিনীর নিত্য সহচর ও সাম্প্রদায়িক শাসকগোষ্ঠীর পদলেহনে তৎপর। তাই এবারের শহীদ দিবস নূতন করে স্মরণ করিয়ে দেয় জুম্ম জাতির জাতীয় অস্তিত্ব ও জুম্মভূমির অস্তিত্ব রক্ষার্থে শহীদদের রক্তে রঞ্জিত পথে এগিয়ে যেতে ও চার কুচক্রী তথা প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী দালাল ও দুলাগোষ্ঠীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। সর্বোপরি সকল রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজি ও ষড়যন্ত্রকে মূলোৎচ্ছেদ, বিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিরোধ, দুর্নীতিবাজ ও সুবিধাবাদীদের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিয়ে জুম্ম জাতীয় ঐক্য সংহতিকে সুদৃঢ় ও সুসংহত করা তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের পাশাপাশি গণআন্দোলন জোরদার করে তোলা একান্তই বাঞ্ছনীয়। অতএব শাসক-শোষক গোষ্ঠীর সকল প্রকারের বঞ্চনা, নিপীড়ন নির্যাতন ও ষড়যন্ত্র চিরতরে অবসানের লক্ষ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে অধিকতর ভূমিকা ও অবদান রাখার ক্ষেত্রে আজকের এই দিনে জুম্ম জাতি বিশেষতঃ শিক্ষিত জুম্ম যুব সমাজকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে সর্বাত্মকভাবে অংশ গ্রহণ একান্তই জরুরী ও অপরিহার্য। অতএব বিদ্যমান বাস্তব অবস্থা ও পরিস্থিতির আলোকে আজকের এই অবিস্মরণীয় ও শোকাবহ দিনে জন সংহতি সমিতি জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে সামিল হতে আবারো উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

'আমি বাঙালী নই': এম এন লারমার ঐতিহাসিক প্রতিবাদ

—শ্রী উদয়ন

জুম্ম জাতীয় চেতনার অগ্রদূত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহের আলোকবর্তিকা, নিপীড়িত জাতি ও মেহনতি মানুষের একনিষ্ঠ বন্ধু, মহান বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সমগ্র জীবনটাই হচ্ছে অবিস্মরণীয় সংগ্রামের ইতিহাস। তাই এম এন লারমার সাংসদীয় জীবনও ছিল সংগ্রাম মুখর। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশের গণ পরিষদে আওয়ামী লীগের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। এই গণ পরিষদে এম এন লারমাই ছিলেন একমাত্র সদস্য যিনি নির্দলীয় এবং তিনি তার সাংসদীয় জীবনে একাই একাধারে জুম্ম জনগণের ন্যায্য অধিকারের জন্য এবং বাংলাদেশের আপামর মেহনতি ও নির্যাতিত জনতার পক্ষে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশের নব্য শাসকগোষ্ঠী যখন আত্মহারা ও উগ্র বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী চেতনায় দিশাহারা এবং যখন জুম্ম জনগণ তথা বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিবাসী জাতিসত্তাসমূহের অস্তিত্ব চিরতরে লুপ্ত করে দিয়ে বাঙালী জাতিতে পরিণত করার ষড়যন্ত্র চলছিল তখন 'আমি আঙালী নই' গণ পরিষদের ভেতরে ও বাইরে এম এন লারমার বজ্রকঠিন এই জবাব নিঃসন্দেহে একটা অতুল নীয় ও অবিস্মরণীয় সাহসী প্রতিবাদ।

'আমি বাঙালী নই"—এম এন লারমার এ বলিষ্ঠ জবাব ঐতিহাসিক বাস্তবতারই এই অনিবার্য ফলশ্রুতি। এটা আজ কারো অবিদিত নয় যে—শত শত বছর ধরে জুম্ম জনগণের উপর চলে আসছে নির্মম বিজাতীয় শাসন শোষণ।

এ ধারা শুরু হয় সুদূর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্ত থেকে ব্রিটিশ, পাকিস্তান, বাংলাদেশ—একের পর এক ঔপনিবেশিক শক্তির পালা-বদল ঘটতে থাকে। কিন্তু জুম্ম জনগণের ভাগ্যের আকাশে মেঘের ঘনঘটা কখনোই কমেনি। অধিকন্তু ক্রমবর্ধমান হারে হয়েছে অধিকতর ঘনীভূত। একদিকে দেশীয় সামন্ত শ্রেণীর অর্থনৈতিক, অদূরদর্শী ও স্বেচ্ছাচারী শাসন ও জুলুম অপরদিকে ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর সীমাহীন শোষণ, নির্যাতন ও নিপীড়নে জুম্ম জনগণের জীবন বিষময় হয়ে উঠে। এমনি এক ক্রান্তি কালে পাকিস্তান সরকার জুম্ম জনগণের সর্বনাশা ফাঁদ কাপ্তাই বাঁধ নির্মান করে জুম্ম জনগণের জাতীয় জীবন চরমভাবে বিপন্ন করে তোলে। পাশাপাশি মরার উপর খাড়ার ঘা এর মত পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক অস্তিত্বের মর্যাদা একতরফাভাবে তুলে দিয়ে যুগপৎভাবে চলতে থাকে বাঙালী মুসলমান অনুপ্রবেশের জঘন্যতম ষড়যন্ত্র। ফলে প্রায় এক লক্ষের মতো জুম্ম ভারত ও বার্মায় পাড়ি জমাতে বাধ্য হয়।

অতঃপর এক রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধের পর অভ্যুদয় ঘটে বাংলাদেশের। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা—এই চার মূল নীতির ভিত্তিতে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে বাংলাদেশের আপামর জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের জোয়াল থেকে মুক্তিলাভ করে। কিন্তু ইতিহাসের নির্মম পরিনতি এই যে—ঘৃন্য জাতিগত শাসন-জুলুমের যাঁতাকল থেকে সদ্য মুক্তি প্রাপ্ত বাংলাদেশের নব্য শাসকগোষ্ঠী একই কায়দায় নির্লজ্জভাবে জুম্ম জনগণের উপর জাতিগত নিপীড়ন-নির্যাতনের আশ্রয় নেয়। জুম্ম জনগণ তথা বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিসত্তাসমূহকে বাঙালী জাতির অঙ্গ বলে ঘোষণা দেয়া হতে থাকে। বাস্তবায়ন করা হতে থাকে অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম বাঙালী অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিণত করার ষড়যন্ত্র—যা পশ্চিম পাকিস্তানী মৌলবাদী সামরিক শাসকগোষ্ঠী অসমাপ্ত অবস্থায় রেখে যেতে বাধ্য হয়। কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঘোষণা—'উর্দু' 'কেবল উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' ঠিক সে রকম কায়দায় বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক ঘোষণা করা হতে থাকে যে-'বাংলাদেশে একটি মাত্র জাতি তা হলো বাঙালী জাতি'। এভাবেই শুরু হয় অমুসলিম জুম্ম জনগণকে মুসলিম বাঙালীতে পরিণত করার ঘৃন্য রাষ্ট্রীয় পাঁয়তারা। তাই এই ঐতিহাসিক বাস্তবতা থেকেই এম এন লারমা "আমি বাঙালী নই' —বজ্রকঠিন প্রতিবাদে গর্জে উঠতে বাধ্য হন।

বলা বাহুল্য এম এন লারমার জীবনটাই ছিল একটা সংগ্রামের ইতিহাস। কাপ্তাই বাঁধের ফলে উদ্বাস্তু জুম্ম জনগণের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন না দেয়ায় প্রতিবাদ জানানো থেকে শুরু করে জুম্ম ছাত্র সমাজের প্রত্যক্ষ ভূমিকায় অধিকার হারা ও ঘুমন্ত জুম্ম জনগণকে অধিকার সচেতন করা সহ গোটা ষাট দশকটাই আন্দোলনের ভিত্তি প্রস্তর নির্মাণে তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত স্বায়ত্বশাসন সহ ষোল দফা নির্বাচনী মেনোফেস্টোর ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করে তিনি ১৯৭০ সালের পূর্বে পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হন।

বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পর পরই পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত স্বায়ত্বশাসন আদায়ের লক্ষ্যে এম এন লারমা কঠোর সংগ্রামী-প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। বাংলাদেশের কতিপয় রাজনৈতিক দল থেকে এ বিষয়ে সমর্থনের আশ্বাসও তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু কার্যতঃ তা ছিল কেবল মুখের বুলি ও কাগজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাস্তব ক্ষেত্রে বিশেষ রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করে কোন দলই এগিয়ে আসেনি। ফলতঃ এম এন লারমা জুম্ম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভিত্তিক আন্দোলন ও একটি শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক দল গঠনে প্রয়াসী হন। বাহাত্তরের ১৫ই ফেব্রুয়ারী জুম্ম জনগণের প্রগতিশীল ও দেশপ্রেমিক অংশকে নিয়ে গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতি। তাঁরই নেতৃত্বে জন সংহতি সমিতি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে।

৩১শে অক্টোবর, ১৯৭২ সাল। জুম্ম জনগণের একটি কালো দিবস। স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তার অধিকারী জুম্ম জনগণকে সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে বাঙালীতে পরিণত করার একটি ঘৃণ্য দিবস। ঐদিন সংবিধান বিল বিবেচনা

(দফাওয়ারী পাঠ) এর উপর বাংলাদেশ গণ পরিষদের অধিবেশন চলছিল। নিয়ংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকারী আওয়ামী লীগের জনৈক সদস্য আহম্মদ রাজাক ভুঁইয়া গণপরিষদের বিবেচনাধীন সদ্য রচিত বাংলাদেশ সংবিধান বিলের ৩ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে একটি সংশোধনী প্রস্তাব উথাপন করেন। সংশোধনী প্রস্তাবটি হলো নিম্নরূপ—

"বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে, বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালী বলিয়া পরিচিত হইবেন।"

পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য এম এন লারমা সাথে সাথে এর তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। তিনি বললেন—

"……আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি, সেই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে বাস করে আসছে। বাংলাদেশের বাংলা ভাষায় বাঙালীদের সঙ্গে আমরা লেখাপড়া শিখে এসেছি। বাংলাদেশের সঙ্গে আমরা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। সব দিক দিয়েই আমরা একসঙ্গে একযোগে বসবাস করে আসছি। কিন্তু আমি একজন চাকমা। আমার বাপ, দাদা, চৌদ্দ পুরুষ কেউ বলেন নাই আমি বাঙালী।"

"আমার সদস্য সদস্যা ভাই-বোনদের কাছে আমার আবেদন—জানি না আজ আমাদের এই সংবিধানে আমাদেরকে কেন বাঙালী বলে পরিচিত করতে চায়। … মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমাদেরকে বাঙালী জাতি বলে কখনো বলা হয় নাই। আমরা কোনদিনই নিজেদেরকে বাঙালী বলে মনে করি নাই। আজ যদি এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধানের জন্য এই সংশোধনী পাশ হয়ে যায়, তাহলে আমাদের এই চাকমা জাতির অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাবে। আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। আমরা আমাদেরকে বাংলাদেশী বলে মনে করি এবং বিশ্বাস করি। কিন্তু বাঙালী বলে নয়।"

এম এন লারমার এই যুক্তিসংগত ঐতিহাসিক আবেদন সেদিন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গণ পরিষদ কক্ষে কেবল ধ্বনিত হয়েছে। বস্তুতঃ কারো নিকট গণতান্ত্রিক ও মানবিক চেতনা সৃষ্টি করেনি। সেদিন পরিষদ কক্ষে একমাত্র বাঙালী জাতীয়তাবাদই পরম সত্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, উক্ত সংশোধনী প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠদের দৌলতে অনায়াসে সেদিন পাশ হয়ে যায়। এম এন লারমা ক্ষোভে, দুঃখে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সেদিন গণপরিষদের অধিবেশন বর্জন করেন। তৎপ্রেক্ষীতে তদানিন্তন শিল্পমন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলাম গণ পরিষদে বলেন যে—

"…"বাঙালী হিসেবে পরিচয় দিতে রাজী না হয়ে বাবু মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এই পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করেন। …তিনি যাঁদের প্রতিনিধিত্ব করেন, তাঁদের প্রস্তাব উথাপন না করে, বাঙালী পরিচয়ের প্রতিবাদে যাঁদের নাম করে এই পরিষদ-কক্ষ পরিত্যাগ করে চলে গেছেন, তাঁরা বাঙ্গালী জাতির অঙ্গ। পার্বত্য চট্টগ্রামে যে ৫লক্ষ উপজাতি রয়েছে তারা বাঙালী। তারা সাড়ে ৭ কোটি বাঙ্গালীর অঙ্গ বলে আমরা মনে করি।" তিনি আরো বলেন—

"আমি মনে করি, বাবু মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আজকে যে উদ্দেশ্যে পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করেছেন, তিনি যাঁদের প্রতিনিধিত্ব করছেন, তাঁদের জন্য তিনি সেটা করতে পারেন নাই—যদিও তিনি গর্ব করে বলে থাকেন, আমি বাঙালী নই।"

"তার কাছে আমার অনুরোধ, তিনি পরিষদে এসে তাঁর দায়িত্ব পালন করুন। পরিষদে এসে বাঙালী জাতীয়তাবাদের মহান প্রস্তাবকে সফল করে তুলুন। আমি আশা করব যে, বাঙালী হিসেবে তিনি তাঁর নিজস্ব অঞ্চল ও নিজের পরিচয় দেওয়ার সুযোগ গ্রহণ করবেন।"

এম এন লারমা অবশ্য সৈয়দ নজরুল ইসলামের আহ্বানে বাঙালী হিসেবে তাঁর নিজস্ব অঞ্চল ও নিজের পরিচয় দিতে এগিয়ে যাননি। বরং পশ্চাদপদ জুম্ম জনগণকে সাথে নিয়ে তিনি জুম্ম জাতীয়তাবাদের ধ্বজা বীরদর্পে আজীবন উড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের জন্য নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত স্বায়ত্বশাসনের জন্য আপোষহীন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসন কাঠামো এবং জুম্ম জনগণের স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তা ও বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে সংবিধানে সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ণের জন্য তিনি তৎকালীন সংবিধান প্রণয়ন কমিটির নিকট স্বায়ত্বশাসনের দাবী তুলে ধরেন। অপরদিকে এম এন লারমা সহ ১৬ সদস্যক এক জুম্ম প্রতিনিধিদল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ

মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করে স্বায়ত্ব শাসনের দাবী তুলে ধরেন। কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাস—জুম্ম জনগণের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এম এন লারমা তবুও ক্ষান্ত হয়নি। সর্বশেষ—পর্যায়েও (২রা নভেম্বর'৭২) সংবিধান বিলে ৪৭ক নামে একটি নতুন অনুচ্ছেদের সংযোজনী প্রস্তাব এনে তিনি স্বায়ত্বশাসনের দাবী আরেকবার উত্থাপন করেন। উক্ত সংযোজনী অনুচ্ছেদে তিনি প্রস্তাব করেন যে—

"পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি উপজাতি অঞ্চল বিধায় উক্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকারের নিরাপত্তার জন্য উক্ত অঞ্চল একটি উপজাতীয় স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল হইবে।"

—এই প্রস্তাবের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা দেন তিনি এভাবে—

"পার্বত্য চট্টগ্রামে আমরা দশটি ছোট ছোট জাতি বাস করি। চাকমা, মগ (মারমা), ত্রিপুরা, লুসাই, বোম, পাংখো, খুমি, রিয়াং, মুরুং ও চাক এই দশটি ছোট ছোট জাতি সবাই মিলে আমরা নিজেদেরকে পাহাড়ী বা 'জুম্ম' বলি —।"

এম এন লারমার এ প্রস্তাবও বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় মূল নীতির বিরোধী ও বিধি বহির্ভূত বলে ঘোষণা করা হয়। বস্তুতঃ জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন জরুরী ও অপরিহার্য ছিল। আর সেখানেই ক্ষীপ্রগতিতে ধেয়ে আসা উগ্র ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের ফলশ্রুতি হিসেবেও জুম্ম জাতীয়বাদের উন্মেষও ছিল এক অনিবার্য পরিনতি। এটা নিছক কোন সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার প্রতিফলন নয়। নিঃসন্দেহে এর পেছনে গভীর রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক ভিত্তি অন্তর্নিহিত।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ সামাজিক, সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় তথা জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী জাতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী। অথচ ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী জুম্ম জনগণের এই পৃথক সত্তাকে বরাবরই পদদলিত করে জুম্ম জনগণকে নিশ্চিহ্নকরণের ষড়যন্ত্র চালিয়ে আসছে। "ভাগ করে শাসন করা" নীতির ভিত্তিতে দশ ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জনগণকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ এযাবৎ শাসন-শোষণ জারী রেখে আসছে। পাশাপাশি দেশীয় ও জাতীয় সামন্তপ্রভু ও প্রতিক্রিয়াশীল অংশ ঔপনিবেশিক শক্তির পোষা কুকুরে পরিণত হয়ে জুম্ম জনগণের উপর অত্যাচার নিপীড়ন চালাতে থাকে। অপরদিকে জুম্ম জনগণ ছিল অশিক্ষা-কুশিক্ষা ও সামন্ত চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন। এমনি এক অনুন্নত ও ঘুনে ধরা সমাজে আবদ্ধ অথচ শত শত বছর ধরে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে নিষ্পেষিত জুম্ম জনগণকে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ করা ও সকল প্রকার শোষণ-নিপীড়ন থেকে মুক্তির জন্য এম এন লারমা 'জুম্ম জাতীয়তাবাদ'এর উন্মেষ ঘটাতে প্রয়াসী হন। তাঁর এই দর্শন ইতিহাসেরই এক অনিবার্য দাবী—যা তিনি বিকশিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

জুম্ম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই এম এন লারমা দশ ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জাতিসত্তাসমূহের জন্য সর্বদা সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। তিনি বরাবরই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের উর্দ্ধে ছিলেন। তাই তাঁর সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরের রাজনৈতিক জীবন পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। তিনি একজন চাকমা হিসেবে যেমনি চাকমা জাতির অস্তিত্ব ও বিকাশের জন্য চিন্তা ভাবনা করতেন তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য মারমা, ত্রিপুরা, মুরুং, বোম, খিয়াং, লুসাই, খুমি, পাংখো ও চাক এর অস্তিত্ব ও বিকাশের জন্য আমরণ সংগ্রাম করে গেছেন। তাই সংসদেও তিনি প্রতিটি জাতিসত্তার কথা বলিষ্ঠ কণ্ঠে তুলে ধরতেন। ১৯৭৩-৭৪ অর্থ বৎসরের বাজেট অধিবেশন চলাকালে (২৩শে জুন' ১৯৭৩) অনুন্নত ও পশ্চাদপদ জাতিসত্তাসমূহের উন্নয়নের অত্যাবশ্যকীয়তা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সংসদে তিনি বলেন—

"..... আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা, মগ, ত্রিপুরা, লুসাই, বোম, পাংখো, খুমি, খিয়াং, মুরুং ও চাক— এই দশটি ছোট ছোট উপজাতি বাস করে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে মুরুং, খুমি, খিয়াং, পাংখো ও বোম উপজাতিরা পিছিয়ে পড়ে আছে ...।"

'জুম্ম' শব্দকে একটি পেশার অভিধা হিসেবে চিহ্নিত করে একশ্রেণীর কায়েমী স্বার্থবাদী জুম্ম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিকে উড়িয়ে দেওয়ার ব্যর্থ প্রয়াস চালায়। শব্দের বুৎপত্তিগত অজ্ঞতা কিংবা সচেতনভাবেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। বস্তুতঃ যিনি জুম চাষ করেন তাকে জুম্ম বুঝায় না, তাকে বলা হয় জুমচাষী (জুমিয়া)। জুম্ম শব্দের অর্থ যিনি পাহাড়ে বসবাস করেন। জুম শব্দ থেকে এ শব্দের উৎপত্তি। জুম হলো ধান, তুলা, তিল, মরিচ, শাক-সব্জি ইত্যাদি খাদ্যশস্য সমেত আবাদী পাহাড়ই জুম। সুতরাং জুম অর্থ পাহাড়। আর এই অর্থে জুম্ম শব্দের অর্থ পাহাড়ের অধিবাসী বা পাহাড়ী। তাই এটা পেশাগত অভিধা নয়, বরং ইহা ভৌগলিক জীবনধারার সাথে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারাও গভীর-ভাবে সম্পৃক্ত ও বিজড়িত। গঙ্গার 'ব'-দ্বীপের ভৌগলিক অবস্থান থেকেই বঙ্গ এবং বঙ্গ থেকে বাঙালী শব্দের উৎপত্তিগত ভৌগলিক ভিত্তিকে কি কখনো অস্বীকার করা যেতে পারে ?

এম এন লারমা কখনোই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় পরিচালিত হননি। বাংলাদেশের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে তিনি বরাবরই সংগ্রামে রত ছিলেন। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন মহৎ হৃদয়ের অধিকারী এক সাচ্চা মানবতা-বাদী, মেহনতি ও নির্যাতিত মানুষের পরম বন্ধু। তিনি কেবল জুম্ম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য লড়াই করে যাননি। পাশাপাশি তিনি সমাজ থেকে দুর্নীতি উচ্ছেদ, বিশেষ ক্ষমতা আইন রদ, কারাগার সংস্কার, পতিতাদের পুনর্বাসন, বাক-স্বাধীনতা সহ বাংলাদেশের কৃষক, শ্রমিক, জেলে, তাঁতি, কর্মচারী, কারাবন্দী তথা আপামর শ্রমজীবী ও নিপীড়িত মানুষের জন্য সংসদে লড়াই করে গেছেন। ২৫শে অক্টোবর, ১৯৭২ইং সংবিধান বিলের উপর আলোচনা করতে গিয়ে এসব বঞ্চিত ও উপেক্ষিত জনগণের স্বপক্ষে জোরালো বক্তব্য তুলে ধরেন এভাবে—

"... আজ আমি দেখতে পাচ্ছি, পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী বুড়িগঙ্গা, মাথাভাঙ্গা, শঙ্খ, মাতামুহুরী, কর্ণফুলী, যমুনা, কুশিয়ারা প্রভৃতি নদীতে রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে যারা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরে নিজেদের জীবন তিলে তিলে ক্ষয় করে নৌকা বেয়ে, দাঁড় টেনে চলেছেন, রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যাঁরা শক্ত মাটি চষে সোনার ফসল ফলিয়ে চলেছেন, তাদের মনের কথা এ সংবিধানে লেখা হয়নি। আমি বলছি, আজকে যাঁরা রাস্তায় রাস্তায় রিক্সা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে চলেছেন, তাঁদের মনের কথা এই সংবিধানে লেখা হয়নি।

"... সবচেয়ে দুঃখজনক কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের মা-বোনদের কথা এখানে নাই। নারীর যে অধিকার সেটা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। ...যদি এটা গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক সংবিধান হতো, তাহলে আজকে যারা নিষিদ্ধ পল্লীতে নিজেদের দেহ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করছে, তাদের কথা লেখা হত, তাদেরকে এই নরক যন্ত্রনা থেকে মুক্ত করে আনার কথা থাকত... ..."

"...একদিকে হিংসাদ্বেষ-বিহীন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, আর অন্যদিকে উৎপাদনযন্ত্র ও উৎপাদন ব্যবস্থাসমূহের মালিকানা, রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সমবায়ী মালিকানা ও ব্যক্তিগত মালিকানা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে শোষণের পথ প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছে।"

—এম এন লারমার উক্ত মূল্যায়ণ ও বিশ্লেষণ আজ বৈজ্ঞানিক সত্যে পরিণত হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তে বাংলাদেশের নব্য শাসকগোষ্ঠীর নিকট ক্ষমতা বদল হয়েছে। এ ক্ষমতা বদল-বদলে বাংলাদেশের ব্যাপক মেহনতি মানুষের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। অধিকন্তু আরো নগ্নভাবে শোষণের পথ প্রশস্ত হয়েছে। জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে ৫ই জুলাই, ১৯৭৪ ইং বাংলাদেশের সামগ্রিক অবস্থার মূল্যায়ণ করেন এভাবে—

" আজকে আমাদের সমাজ জীবনে এত হতাশা কেন ? সরকার যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন, সেই কার্যক্রম ঠিকমতো হচ্ছে না। একদিকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়, অন্যদিকে শোষণ পদ্ধতি রাখা হয়। ...যদি আমরা যোগ-বিয়োগ করি তাহলে ফল পাব শূণ্য। অর্থনীতিকে কিভাবে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে গড়ে তুলব, তার কোন সদিচ্ছা নাই। সদিচ্ছা নাই বলে আজকে

আমাদের এই অবস্থা। তাই আমি অত্যন্ত দুঃখভরে এই কথা বলতে চাই যে, সরকারের এই যে ব্যর্থতা আজ প্রতিটি ক্ষেত্রে বিরাজমান। এটা আমরা কৃষিতে দেখতে পাব, শিল্পে পাব, বন বিভাগে দেখতে পাব, প্রত্যেকটি বিভাগেই এই ব্যর্থতা দেখতে পাব। তিনি আরো বলেন—

"মানুষকে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার অধিকার দিতে হবে। মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে। সেটা যদি দিতে না পারেন, তাহলে জনসাধারণ আপনাদের ক্ষমা করবে না। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে নাই।" বস্তুতঃ এম এন লারমার এই মূল্যায়ণ এক ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত হতে আমরা দেখেছি।

নব্য শাসকগোষ্ঠীর চরম আধিপত্যের যুগেও এম এন লারমা অকুতোভয় চিত্তে এ বৈজ্ঞানিক সত্যকে উচ্চারণ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। সমগ্র বাংলাদেশে শহীদ এম এন লারমা একটি অবিস্মরণীয় নাম। তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই। জাতীয় কুলাঙ্গার বেইমান-গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের এক বিশ্বাসঘাতকতামূলক অতর্কিত হামলায় ১৯৮৩ সালের ১০ই নভেম্বর তিনি নৃশংসভাবে শাহাদাৎ বরণ করেন। অথচ ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে যেই এম এন লারমা তাঁর সাংসদীয় তথা রাজনৈতিক জীবনে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে, বাংলাদেশের শান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বোপরি জুম্ম জনগণ সহ বাংলাদেশের কৃষক, শ্রমিক তথা আপামর জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করে গেছেন জাতীয় সংসদের সেই মহান সদস্য এম এন লারমার মৃত্যুতে অদ্যাবধি জাতীয় সংসদে কোন শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি। এমনকি কোন দলের পক্ষ থেকে সম্মানিত সংসদ সদস্যও এম এন লারমার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনার্থে শোক প্রস্তাব উত্থাপনের আবেদন তুলে ধরেননি।

তা সত্ত্বেও উগ্র বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ও উগ্র ইসলামী সম্প্রসারণবাদ তার প্রভুদের নির্দেশে ষড়যন্ত্রের পর ষড়যন্ত্র চালিয়ে গেলেও এম এন লারমার মহান অবদান ও স্মৃতি কোন অবস্থাতেই মুছে দিতে পারে নি। মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা অমর ও অক্ষয়। চার কুচক্রী বিভেদপন্থী বেওয়ারিশ কুকুরেরা নিজেদের হীন স্বার্থ সিদ্ধির আশায় ও কায়েমী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হীন ষড়যন্ত্রে জুম্ম জনগণের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, মহান চিন্তাবিদ, আপোষহীন সংগ্রামী, নিপীড়িত জাতি ও মেহনতি মানুষের পরম বন্ধু এম এন লারমাকে প্রাণে হত্যা করলেও তাঁর শাশ্বত দর্শন ও বিপ্লবী চেতনাকে নিঃশেষ করে দিতে পারেনি। ইতিহাস প্রমাণ করেছে শহীদ এম এন লারমা জীবন্ত এম এন লারমার চেয়ে আরো বেশী শক্তিশালী, আরো বেশী দুর্বার।

জুম্ম জনগণের উপর মানবাধিকার লংঘন

—শ্রী জগদীশ

বিগত ২০ (বিশ) বৎসর ধরে বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের উপর জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার লংঘন করে আসছে। বাংলাদেশ সরকারের এই মানবাধিকার লংঘনের ফলে জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। এর ফলে এখনো ৫০ হাজার জুম্ম বিদেশে শরণার্থী হিসেবে আশ্রিত রয়েছে, কয়েক হাজার পরিবার নিজ বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে উদ্বাস্তু জীবনযাপন করছে এবং অন্যান্যরা ভীতি ও সন্ত্রাসের মধ্যে অনিশ্চিত জীবনযাপন করছে। বলতে গেলে এ মানবাধিকার লংঘন আজ জাতিহত্যার (Ethnocide) পর্যায়ে এসেছে। এক্ষেত্রে বসনিয়া হারজেগোভিনার মুসলমানদের সাথে জুম্মদের ভাগ্য একই ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। এবারের প্রথমে মানবাধিকার বিষয়টি কি, তা আলোচনা করা যাক।

১০ই নভেম্বর '৮৩ স্মরণে

সকল জীবের সেরা জীব মানুষ। মানুষের চিন্তা-শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিই মানুষকে এই শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে এবং মানুষের বাহ্যিক আচরণের মাধ্যমে এই চিন্তা ও বুদ্ধির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সাধারণভাবে মানুষের দু'ধরণের আচরণ পরিলক্ষিত হয়। মানবিক ও অমানবিক আচরণ। মানুষের সৎ বুদ্ধিবৃত্তি-সহনশীলতা সহমর্মিতা, দয়া, করুণা, পরোপকারিতা প্রভৃতি সৎ গুণাবলীর আচরণই মানবিক আচরণ। অন্যদিকে কুট বুদ্ধিবৃত্তি, হিংসা, দ্বেষ, অসহিষ্ণুতা, নিষ্ঠুরতা, পরশ্রী-কাতরতা প্রভৃতি হেতু যে আচরণ, তা অমানবিক আচরণ। মানুষের এই অমানবিক আচরণ মানুষের মানবিক দিক গুলি পযুদস্ত করে, লংঘিত করে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও মর্যাদা। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও মর্যাদা যুগে যুগে ব্যাহত হয়েছে এবং বর্তমানেও তা এ ধারা অব্যাহত রয়েছে, মানুষের এ অবস্থা হতে মানব সমাজের মধ্যে প্রত্যেক মানুষের সমতা ও বৈষম্যহীনতার ধারণার উদ্ভব ঘটেছে, যা বর্তমানে প্রাকৃতিক (নিয়ম) আইন (Natural law) ও নৈতিকতা হিসেবে স্বীকৃত। মানব সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও দর্শনে মানুষের মধ্যে সমতার ধারণা প্রতিষ্ঠিত এবং এ ধারণা হতে উদ্ভব হয়েছে মানবাধিকার নামক বিষয়টি।

মানবাধিকার বিষয়টি দু'টো মৌলিক (বা প্রাথমিক) অধিকার নির্দেশ করে। প্রথমত : মানুষের সহজাত ও অপসারণের অযোগ্য নৈতিক অধিকারসমূহ (Moral Rights) যেগুলি প্রতিটি মানুষের মর্যাদা নিশ্চিত করতে মানুষের মানবিক গুণাবলী হতে উদ্ভূত। দ্বিতীয়তঃ মানুষের আইনগত অধিকারসমূহ (Legal Rights) যেগুলি মানুষের সমাজের আইন সৃষ্টিকারী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। এ অধিকারসমূহ মৌলিক অধিকারসমূহকে নিশ্চিত করতে সমাজের শাসিতরা কি কি অধিকার ভোগ করবে তা নির্দেশ করে।

বস্তুতঃ মানবাধিকার সেই চাহিদাগুলিকে বুঝায়, যেগুলি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেককে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করে ও কাজে লাগানোর সুযোগ দেয়। মানুষের জীবনধারণের জন্য এমন এক পরিবেশ দরকার, যেখানে ব্যক্তির মর্যাদা ও উদ্যমশীলতা সংরক্ষিত হবে ও যথার্থ স্বীকৃতি পাবে। তাই এ মানবাধিকার লংঘিত হলে দেখা দেয় রাজনৈতিক ও সামাজিক অসন্তোষ, যুদ্ধ বিগ্রহ, জাতিতে জাতিতে বৈরীতা এবং একই জাতির অভ্যন্তরে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত।

বর্তমানে রাষ্ট্রই হলো মানবাধিকার সংরক্ষণের প্রধান রক্ষক (Protector) এবং জামিনদার (Guarantor)। কিন্তু কোন এক রাষ্ট্রে মানবাধিকার সংরক্ষিত হচ্ছে কি লংঘিত হচ্ছে সেই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা অন্য রাষ্ট্রের নেই। তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হতে এ বিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে যে, মানবাধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব কেবলমাত্র সরকারের উপর ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। এ মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য দরকার আন্তর্জাতিক প্রয়াস। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য কেবলমাত্র রাষ্ট্রের উপর নির্ভর না করে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ নেয়ার জন্য জনমতের চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশেষতঃ বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বিজিত ও অধিকৃত অঞ্চলে মানবাধিকার চরমভাবে লংঘিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বিজিত জাতি, ধর্ম ও জাতীয়তা ধ্বংসের সবরকম প্রচেষ্টা চালানো হয়। মানবাধিকার লংঘনের এ নির্মম অভিজ্ঞতা থেকে আন্তর্জাতিক প্রয়াসের মাধ্যমে মানবাধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী ও অপরিহার্য হয়ে উঠে। বস্তুতঃ আন্তর্জাতিক শান্তি ও উন্নতির জন্য দরকার বিশ্বের সর্বত্র মানবাধিকার সংরক্ষণ করা। পরিশেষে ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয় এবং জাতিসংঘের সনদে উল্লেখিত অধিকার ও স্বাধীনতার আলোকে মানবাধিকার বিল (International Bill of Human Rights) উত্থাপনের ভার দেয়া হয়। এরপর ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে মানবাধিকার বিলের ১ম অংশটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং বিশ্ব মানবাধিকার ঘোষণা দেয়া হয়। এ ঘোষণায় বলা হয় যে, এ মানবাধিকার বিলটি হচ্ছে বিশ্বের সকল মানুষের ও সকল জাতির A Common Standard of Achievment.

ঐ ঘোষণার পর থেকে প্রতি বছর ১০ই ডিসেম্বর "বিশ্ব মানবাধিকার দিবস" হিসেবে সারা বিশ্বে পালিত হয়ে আসছে।

১৯৪৮ সালে গৃহীত মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণায় দুই ধরণের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। প্রথমতঃ মানুষের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার। ঘোষণা পত্রের ৩—২১ অনুচ্ছেদগুলোতে এ অধিকারসমূহ বিবৃত করা হয়েছে। শত শত বছর ধরে গণতান্ত্রিক সমাজের ক্রমবিকাশের ধারায় ধীরে ধীরে এ অধিকারগুলো রূপলাভ করেছে। দ্বিতীয়তঃ অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার। এসব অধিকারসমূহ ভোগ করার মাধ্যমে রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার আরো অর্থবহ হয়ে উঠে। ঘোষণা পত্রের ২২—২৮ অনুচ্ছেদগুলোতে এ অধিকারসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

মানবাধিকার বিষয়ক সার্বজনীন ঘোষণায় বলা হয়েছে, মানব সমাজের প্রতিটি সদস্যের আত্মমর্যাদা ও অবিচ্ছেদ্য সম অধিকারের স্বীকৃতিই হচ্ছে বিশ্বের স্বাধীনতা, ন্যায়-বিচার ও শান্তির মূল ভিত্তি। এতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাতিসংঘের সদস্যদেশগুলো মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে অঙ্গীকারবদ্ধ। সাধারণ পরিষদ অতঃপর এ ঘোষণাকে সকল মানুষ ও জাতির জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমাজের প্রতিটি অংশকে এসব অধিকার, স্বাধীনতার মর্যাদা বিধান এবং এগুলো সার্বজনীন স্বীকৃতি ও প্রয়োগ করার লক্ষ্যে সচেষ্ট হতে হবে।

১৯৪৮ সালে ঘোষিত সার্বজনীন মানবাধিকারসমূহ (১ম অংশ)

১। মর্যাদা ও অধিকারের ক্ষেত্রে সকল মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন ও সমান।

২। জাতি, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা-ধর্ম, মতবাদ, জাতীয় ও সামাজিক অবস্থান, জন্ম, সম্পত্তি ইত্যাদি বৈষম্য নির্বিশেষে প্রত্যেকে ঘোষিত সকল স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করবে।

৩। ব্যক্তির জীবনযাপন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার।

৪। দাসত্ব থেকে মুক্তি।

৫। নির্যাতন ও নিষ্ঠুর, অমানবিক ও অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তি থেকে অব্যাহতি।

৬। আইনের চক্ষে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি।

৭। আইনের চক্ষে সমান ও সম নিরাপত্তা।

৮। মৌলিক অধিকার লংঘনের ক্ষেত্রে কার্যকর আইনগত প্রতিকার।

৯। জবরদস্তিমূলক গ্রেপ্তার, আটক ও নির্বাসন থেকে মুক্তি।

১০। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ট্রাইবুনালে ন্যায়বিচার ও প্রকাশ্য শুনানি।

১১। দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নিরাপরাধ হিসেবে বিবেচিত।

১২। ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার বাসগৃহ বা চিঠিপত্র আদান প্রদানে স্বৈরাচারী হস্তক্ষেপ থেকে অব্যাহতি।

১৩। চলাচল ও বসবাসের স্বাধীনতা।

১৪। আশ্রয় লাভের অধিকার।

১৫। জাতিসত্তা।

১৬। বিবাহ ও পরিবার গঠন।

১৭। সম্পত্তির মালিকানা।

১৮। চিন্তা, বিবেক ও ধর্মাচরণের স্বাধীনতা।

১৯। মতামত প্রকাশ ও অভিব্যক্তির স্বাধীনতা।

২০। শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সংগঠন করার অধিকার।

২১। সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ ও সরকারী চাকুরিতে সমানাধিকার।

২২-২৮ পর্যন্ত অনুচ্ছেদে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ বিবৃত হয়েছে।

২২। সামাজিক নিরাপত্তা।

২৩। কাজকর্ম এবং ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও যোগদান।

২৪। বিশ্রাম ও বিনোদন।

২৫। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও সামাজিক সেবা পাওয়ার অধিকার।

২৬। শিক্ষার অধিকার।

২৭। সমাজের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ।

২৮। প্রত্যেক ব্যক্তি এমন এক সামাজিক ও আন্তর্জাতিক পরিবেশে বসবাসের অধিকারী যেখানে ঐ ঘোষণায় উল্লেখিত সকল অধিকার ও স্বাধীনতা পূর্ণরূপে কার্যকর করা যায়।

২৯। ব্যক্তিত্বের বিকাশ, সমাজের সামাজিক কল্যাণে আইন ও নীতিমালা মেনে চলা।

৩০। এই ঘোষণায় লিপিবদ্ধ অধিকার ও স্বাধীনতা লংঘনের উদ্দেশ্যে কোন রাষ্ট্র, দল ও ব্যক্তি এ ঘোষণার কোন অনুচ্ছেদ ব্যবহার বা ব্যাখ্যা করতে পারবে না।

উপরোক্ত অধিকারগুলি মানবাধিকার ঘোষণার প্রথম অংশের মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে। মানবাধিকারের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ ১৯৬৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়। মানবাধিকার বিলের দ্বিতীয় অংশটি হচ্ছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি International Covenant on Ecnomic, Social and Cultural Rights এবং তৃতীয় অংশটি হলো নাগরিক ও রাজনৈতিক বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি (International Covenant on Civil and Political Rights)। এই অধিকারগুলি প্রয়োগার্থে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তবে এসব চুক্তি কার্যকর হয় ১৯৭৬ সালে। ১৯৮১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর বিশ্বের ৬৮টি রাষ্ট্র দ্বিতীয় অংশটি ও ৬৬টি রাষ্ট্র তৃতীয় অংশটি অনুমোদন করে।

মানবাধিকার ও জুম্ম জনগণ

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ ১৯৪৮ সালে ঘোষিত সার্বজনীন মানবাধিকার থেকে আজ সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। জুম্ম জনগণের উপর এই মানবাধিকার লংঘন ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সাথে সাথে শুরু হয়েছে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে অদ্যাবধি চলছে। সরকারের দৃষ্টিতে বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে দুই শ্রেণী মানুষের অবস্থান-(১) জুম্ম জনগণ, (২) বাঙালী মুসলমান। বাংলাদেশ সরকার যেভাবে অতি সহজে এই শ্রেণীভেদ চিহ্নিত করেছে, সেভাবে অতি সুস্পষ্ট হীন লক্ষ্যও নির্ধারণ করেছে। আর তা হলো জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য অঞ্চলকে মুসলমান অধ্যুষিত পার্বত্য অঞ্চলে পরিণত করা। এ উদ্দেশ্যে সরকার আবার দু'টি পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। প্রথম পদ্ধতি হচ্ছে—পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক বাঙালী মুসলমানের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে জুম্মদেরকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করা। এক্ষেত্রে শান্তিবাহিনী দমনের নামে জুম্মদেরকে একচেটিয়া ধরপাকড়, অত্যাচার, নিপীড়ণ, লুণ্ঠতরাজ, নারী ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, হত্যা ও ভূমি বেদখল করে উচ্ছেদের মাধ্যমে সংখ্যালঘু করা হচ্ছে। দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে—খ্রীষ্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জুম্মদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করানো। উপরোক্ত উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার বিগত ২০ বৎসর যাবত জুম্মদের উচ্ছেদমূলক বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে চলেছে। জাতিসংঘের ঘোষিত সকল মানবাধিকার লংঘনের মাধ্যমে সরকার সকল কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এবারে সরকার ও সশস্ত্র বাহিনী কিভাবে মানবাধিকার লংঘন করছে সেগুলো আলোচনা করা যাক।

(১) বাংলাদেশের সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি সত্তাগুলির স্বীকৃতি নেই।

(২) বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী (সেনাবাহিনী, বি ডি আর, আনসার, পুলিশ, ভিডিপি) সদস্যরা যেকোন জুম্মকে সন্দেহবশতঃ গ্রেপ্তার, জিজ্ঞাসাবাদ, আটক, শারীরিক নির্যাতন, নির্যাতনে পঙ্গু করা, খাদ্য ও পানীয় না দেয়া, এমনকি হত্যা করে মানবাধিকার লংঘন করে আসছে।

(৩) সরকারী কর্মকর্তা ও সামরিক অফিসাররা বিভিন্ন সভায়-মিটিংএ জুম্মদেরকে হুমকি প্রদান, ভয় প্রদর্শন, ঠাট্টা-তামাশা করা ও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে থাকে।

(৪) অপারেশনের সময় জুম্মদের ঘরবাড়ী তল্লাসী, চলাচলের সময় দেহ ও মালামাল তল্লাসী করা হয়।

(৫) জেলার কয়েকটি অঞ্চলে জুম্মদের প্রবেশ নিষিদ্ধ, চলাচলে নিয়ন্ত্রণ, গুচ্ছগ্রামে বসবাসের বাধ্য করা, বিভিন্ন স্থানে যেতে অনুমতি নিতে বাধ্য করা হয়।

(৬) জুম্ম জনগণকে বিনামজুরীতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সামরিক ক্যাম্প নির্মাণ, ক্যাম্প ও রাস্তার পাশের

জংগল কাটা, রসদ বহন, পথ দেখানো ইত্যাদি কাজে বাধ্য করা হয়।

(৭) জুম্মদের ব্যবসা-বাণিজ্য করার কোন সুযোগ নেই। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও ঔষধপত্র ক্রয়ে বাধা ও কোটা নির্ধারণ, কমমূল্যে অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে দ্রব্যাদি বেচতে বাধ্য করা, বিনামূল্যে কেড়ে নেয়া ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

(৮) জুম্ম নারীদেরকে ধর্ষণ শ্লীলতা হানি, অপহরণ ও ফুসলিয়ে বিবাহ করা।

(৯) জুম্মদের ভূমি ও পাহাড় বেদখল, জমির দলিল জালিয়াতি করা, ফসল ও বাগ-বাগিচা নষ্ট করে দেয়া হচ্ছে।

(১০) অপারেশনের সময় জুম্মদের গৃহপালিত গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী বিনামূল্যে হরণ করা হয়।

(১১) অপারেশনের সময় ঘর-বাড়ী ও আসবাবপত্র ভেঙ্গে দেয়া হয়, মূল্যবান দ্রব্যাদি লুট করা, গৃহে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

(১২) জুম্মদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিহার, মন্দির ও গীর্জা অপবিত্রকরণ, ধ্বংস লুট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে বাধাদান, অনুমতি নিতে বাধ্য করা, ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তর করা হচ্ছে।

(১৩) আশির দশক পর্যন্ত জুম্মদের কোন সংঘ, দল ও মতামত প্রকাশের গণতান্ত্রিক অধিকার ছিল না।

(১৪) জুম্ম ছাত্র ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা এবং শিক্ষাবৃত্তি, চাকুরী প্রভৃতি সামরিক বাহিনী কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

(১৫) পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসন, উন্নয়ন, সরকারী কার্যক্রম ও সুবিধাদি গ্রহণ, বিচার প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৈষম্য ও বঞ্চনা।

(১৬) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও গণহত্যা বারবার সংঘটিত করা হচ্ছে।

উপরোক্ত মানবাধিকার লংঘনের প্রতিরোধ এবং জুম্মদের সাংবিধানিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামরত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ১৯৮৫ সাল হতে নিয়মিতভাবে জুম্মদের উপর মানবাধিকার লংঘনের বিবরণী প্রকাশ করে আসছে। এসব বিবরণী নিম্নের সারণীতে দেখানো হল।

জুম্ম জনগণের উপর মানবাধিকার লংঘন, ১৯৮৫-১৯৯৪ (আংশিক)

বিভিন্ন ধরণের মানবাধিকার লংঘন

সাল	নির্যাতন	আটক	ধর্ষণ	লুণ্ঠন	অগ্নিসংযোগ	নিখোঁজ	আহত	হত্যা	অন্যান্য	মোট
১৯৮৫	৪৫৩	৫১	৫৮	২৪	৬			২		৫৯৪
১৯৮৬	১০৭৯	১৫২	১৩২	২০৬	১২৯	৯০	৬০	১৪০	৩	১৯৮৪
১৯৮৭	৩০১	৩৯	২১	৫২	১১০		৪৬	১৪		৫৮৩
১৯৮৮	২৭৫	৩০	১৯	১৯	২৫	২৫	৩৪	২২	৫	৪৫৪
১৯৮৯	৬৪৮	৭৩	৪৩	১০৩	১১৯৭	১	৯২	৫৫		২২১২
১৯৯০	৩৬০	২৪	১৬	৮৮	১৬৪		৭	১৯		৬৭৮
১৯৯১	৬৪৯	৮০	১১	১৬৪	২১৫	১২	১২৬	১৫	১৩	১২৮৫
১৯৯২	৬২৭	৪০	৮১	১২৪	১২৪	৫	১০০	৬৮	৮	১১৯৮
১৯৯৩	৩৮৮	১৫	১৭	৭৩	২৯	৩৮	১৬৮	৩১	৩	৭৬২
১৯৯৪ (মে পর্যন্ত)	৯৬		৩৮	১৬			১০	৩	১১	১৭৪
মোট	৪৮৯৬	৫০৪	৪৩৬	৮৬৯	২০১৭	১৭১	৬১৬	৩৭৯	৪৩	৯৯২৪

উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর হতে জুম্মদের উপর এ মানবাধিকার লংঘিত হয়ে আসছে। ১৯৭১ সালের মুক্তি যুদ্ধের বিজয়ের প্রাক্কালে পানছড়ি-দীঘিনালা-মেরুং হত্যাকাণ্ড, ১৯৮০ সালের কলমপতি, ১৯৮১ সালে মাটিরাঙ্গা-বেলছড়ি, ১৯৮৫ সালে ভূষনছড়া হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এসব হত্যাকাণ্ড সারনীতে অন্তর্ভুক্ত নহে। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, পানছড়ি-বেলছড়ি হত্যাকাণ্ডে তিন শতাধিক জুম্ম হতাহত হয়েছিল। শেষোক্ত দুই হত্যাকাণ্ডে কয়েকশত জুম্ম গৃহে লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগ করে হাজার হাজার জুম্মকে নিজ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল। সার্ভাইভেল ইন্টারন্যাশন্যাল এর রিপোর্ট মতে ভূষনছড়া হত্যাকাণ্ডে ৬২ জন নিহত, ২ জন আহত, ৫ জন নিখোঁজ হয়েছিল। এছাড়া এ সময়ের মধ্যে হাজার হাজার জুম্ম পাইকারীভাবে গ্রেপ্তার, নির্যাতন, অযথা জিজ্ঞাসাবাদ, আর্থিক হয়রানী ও শত শত জুম্ম নারী ধর্ষণের শিকার হয়। হাজার হাজার জুম্ম পরিবার লুটতরাজ ও ভূমি বে-দখলে নিঃস্ব হয়েছিল। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস-অপবিত্রকরণ, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বাঁধাদান ও নিয়ন্ত্রণসহ ব্যাপক ধর্মীয় পরিহানী এ সময় ঘটেছিল।

সর্বোপরি বলাবাহুল্য যে, জনসংহতি সমিতির প্রদত্ত মানবাধিকার লংঘনের হিসাবটি একটি আংশিক হিসাব মাত্র। যেহেতু জনসংহতি সমিতির গোচরীভূত ঘটনাগুলো এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে আরো কত শত ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল যেগুলি অপ্রকাশিত রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের উপর এ মানবাধিকার লংঘনের রিপোর্ট শুধুমাত্র জনসংহতি সমিতি নয়, বিশ্বের বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন তথা এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, সার্ভাইভেল ইন্টারন্যাশনাল, ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং গ্রুপ অব ইনডেজেনাস পপুলেশন, ওয়ার্ল্ড ফেলোশিপ অব বুদ্ধিষ্ট, হিউম্যানিটি প্রটেকশন ফোরাম, রিসার্স ইনস্টিটিউট অব অপ্রেসড্ পিপল, পার্বত্য চট্টগ্রাম কেমপেইন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সাপোর্ট গ্রুপ (যুক্তরাজ্য) ইত্যাদি সংস্থা রীতিমত প্রচার করে আসছে। এক্ষেত্রে সার্ভাইভেল ইন্টারন্যাশন্যালের '৮৪তে প্রকাশিত "জেনোসাইড ইন বাংলাদেশ" I W G I A এর "জেনোসাইড ইন চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস্, বাংলাদেশ, (১৯৮৪)," পার্বত্য চট্টগ্রাম অর্গানাইজিং কমিটির "চার্জ অব জেনোসাইড, (১৯৮৬")" এবং এ্যামনেস্টি ইনটারন্যাশন্যালের "আনলফুল কিলিং এণ্ড টর্চার ইন চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস্ (১৯৮৬)" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এসব মানবাধিকার লংঘনের সত্যটা যাচাই করতে গঠিত হয়েছে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন'। এ কমিশন '৯০ এর নভেম্বর-ডিসেম্বর ভারতের ত্রিপুরার জুম্ম শরণার্থী শিবির ও পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিদর্শন করে মানবাধিকার লংঘনের রিপোর্ট সংগ্রহ এবং যে, ১৯৯১ সালে "Life is not Ours" রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। এই রিপোর্টে প্রকাশিত পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের উপর এ মানবাধিকার লংঘনের ঘটনায় সারাবিশ্ব বিচলিত ও বাংলাদেশ সরকার জাতিহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত।

রোমেলঃ—একটি জীবন একটি সংগ্রাম

—শ্রী পেলে

১৯৮৩ সালের ১০ই নভেম্বরের পরের ঘটনা। গিরি প্রকাশ-দেবেন-পলাশ এই চার কুচক্রীয় বিশ্বাসঘাতকতায় এ সময়ে উপদলীয় ষড়যন্ত্র চরম পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছিল। তখন প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে আমাদের পুনঃসংগঠিত হতে হচ্ছিল যেমন কোন বড় ধরণের অস্ত্রোপচারের পর রোগীকে অত্যন্ত সাবধানতার সাথে নিরাময় করার চেষ্টা চালাতে হয়।

সে সময় প্রায় কোন না কোনভাবে আমাদের কঠিন

ধকল সইতে হত। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া গ্রুপগুলো একত্রিত করণের শেষ পর্যায়ের এক ঘটনা। কতিপয় সিনিয়র কর্মীর অবহেলা ও পলায়ণবাদী আচরণের ফলে ছোট্ট একটি দল খাগড়াছড়ি শহরের আশে পাশে চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখী হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তাদের উদ্ধারের সর্বশেষ প্রচেষ্টায় আমরা দুটো দল খাগড়াছড়ি শহরের কাছাকাছি বগড়া পাড়াতে পৌঁছি। একটি দল সামান্য পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে অবস্থান নেয়। আর আমাদের দলটি সান্ধ্য ভোজের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এমন সময়ে হঠাৎ কালবৈশাখী ঝড়ের মত চক্রান্তকারী শত্রুরা প্রচণ্ড আওয়াজে আক্রমণ চালাতে শুরু করে। আধ ঘন্টা ব্যাপী সান্ধ্য আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ হলো। পরে চক্রান্তকারী শত্রুরা যখন পিছু হটে গেল তখন বুঝা গেল শত্রুদের তর্জন গর্জনই ছিল সার। শুধুমাত্র বেকায়দায় ফেলে দেবার প্রচেষ্টা ছাড়া শত্রুরা সামগ্রিক উদ্দেশ্য কিছুই লাভ করতে পারেনি।

যুদ্ধে যে কোন ধরণের ছল-চাতুরী উপেক্ষা করা যায় না। সত্যি সেদিন ঐ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া গ্রুপটির সাথে একত্রিত হতে কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও নুতন করে জ্বালানী ভর্তি করা গাড়ীর মতই আমাদের চূড়ান্ত প্রস্তুতি সমাপ্ত হলো।

দুই শতাধিক টগবগে যোদ্ধার সমাবেশ ঘটিয়ে পাল্টা আক্রমণের পর্যায়ে আমরা প্রবেশ করলাম। আমাদের সুস্পষ্ট কৌশল ছিল শত্রুকে প্রলুব্ধ করে এলাকার গভীরে টেনে এনে ফাঁদে ফেলা। এই উদ্দেশ্যে বড় দল নিয়ে আমি পূর্বদিকের গ্রামের খানিকটা গোপনে অবস্থান নিই। অপেক্ষাকৃত ছোট দলটি নিয়ে ক্যাপ্টেন ঈশ্বর আবার বগড়া পাড়ায় অবস্থান নেয়। শত্রু সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে কম্যাণ্ডাররা তৎপর হয়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে গ্রামের উত্তর পার্শ্বের সেন্ট্রিটি একটা ফায়ার করার সাথে সাথে উইদড্র হয়ে আসে এবং কম্যাণ্ডারকে রিপোর্ট করে যে, বাংলাদেশ আর্মিদের একটি দল পৌঁছে গেছে। কম্যাণ্ডার সরে আসার প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেন। কিন্তু পশ্চিম প্রান্তে অবস্থান নেয়া গ্রুপটি ক্ষুধার্ত বাঘের মতই শত্রুর উপর তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। দেখতে দেখতে শত্রুদের পিছনের দলটিকে পিছু ধাওয়া করে তাদের অবস্থান থেকে সরিয়ে দেয়।

কম্যাণ্ডার আমাকে খবর পাঠান। আমরা পিছন থেকে ঘেরাও করার ফন্দি নিয়ে যেই রওনা হচ্ছিলাম সেই মুহূর্তে দ্রুতগামী কুরিয়ার খবর দিলেন—এরা চক্র নয় (বিভেদপন্থী) এরা বাংলাদেশ আর্মি। কম্যাণ্ডার খবর দিয়েছেন তারা সরে আসবেন। হেড কোয়ার্টারের নির্দেশ মোতাবেক আমরাও ভাবলাম—যেহেতু একই সময়ে দুই মুষ্টিতে আঘাত করা ঠিক নয় সেহেতু আপাততঃ এই শত্রুদের এড়িয়ে যাওয়াটা আমাদের পক্ষে ভাল। অতএব, প্রস্তুত দলটিকে থামানো হলো।

তৎক্ষণাৎ উপর্যুপরি তিনটা মর্টার সেল ফাটানো হলো। তাতে নিশ্চিত হওয়া গেল—এগুলো বাংলাদেশ আর্মিদের যে কোন একটা দল। যেহেতু ক্যাপ্টেন ঈশ্বরের অবস্থান আর আমার অবস্থানের মধ্যে দুরত্ব ১০ মিনিটের পথ। তাই ততক্ষণে দশ মিনিটের বেশী লড়াই চলছিল। আমরা আন্দাজ করার চেষ্টা করছিলাম এতক্ষণে কি একতরফা ফায়ার চলছিল নাকি ক্রস ফায়ারিং? শুনতে শুনতে প্রচণ্ড গতিতে আবার ফায়ার শুরু হলো। তখন অবস্থা আর যাই হোক একটা রিইনফোর্স পাঠানো হলো।

কিছুটা উদ্বেগের মধ্যে আমরা অপেক্ষা করছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে ক্যাপ্টেন ঈশ্বরকে আহত অবস্থায় আনা হয়। পরে আরো একজন গুরুতর আহতকে নিয়ে আসা হল সঙ্গে স্যালাইন লাগানো। আমরা দ্রুত পরিস্থিতির খবর নিলাম।

বগড়া পাড়া ছিল দক্ষিণ পূর্ব কোণ থেকে উত্তর দিকে লম্বালম্বি একটা ছোট টিলার উপরে সারিবদ্ধ গ্রাম। গ্রামের উত্তর প্রান্তটা ছড়ার পাড়। বেশ বড় বড় আম কাঁঠাল গাছ পরিপূর্ণ একটা ছোট্ট বাগিচা। ঐ বাগানে শত্রু বাহিনীরা খুবই শক্তভাবে অবস্থান নিয়েছিল। ক্যাপ্টেন ঈশ্বর যখন সরে আসতে উদ্যত তখন তার সহকারী কম্যানডারটি চিৎকার করে বলতে থাকে, আর্মি নয়—চক্ররা (বিভেদপন্থীরা) ধোঁকা দেয়ার জন্য আর্মি ড্রেস ব্যবহার করছে। সেই যে শোনার সঙ্গে সঙ্গে এ্যাডভান্স আওয়াজ

তুলে দ্রুত এগিয়ে যায়। মুহূর্তেই আম কাঁঠাল বাগানের দুই তৃতীয়াংশ দখল করে নেয়। তখন প্রথম যোদ্ধা লেন্স কর্পোরেল শুভ্র ত্রিপুরার দ্রুত এগোবার সময় পশ্চিম পার্শ্ব থেকে উপর্যুপরি ব্রাশ ফায়ার চলতে থাকে। এক পর্যায়ে শুভ্র ত্রিপুরার রুকস্যাকে কয়েকটি গুলি ভেদ করে চলে যায়। তাকে হামাগুড়ি দিতে হয়।

ক্যাপ্টেন ঈশ্বর দ্রুতগতিতে এগুতে থাকা যোদ্ধাদের ক্রলিং (হামাগুড়ি) দিতে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। এমনি মুহূর্তে তার আগু বাড়াতে উদ্যত পায়ে শত্রুর গুলি ভেদ করে। অনেকটা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে পাটা এগিয়ে যায়। কি ব্যাপার লক্ষ্য করতে করতেই আরেকটা গুলি তার বক্ষ বরাবর ছুয়ে যায়। দু'জায়গা থেকে প্রচুর রক্ত ঝড়ছে দেখে ক্যাপ্টেন ঈশ্বর সঙ্গী মুকেশ এর সহযোগিতায় দু'জনকে নিয়ে সরে আসে এবং সহকারী কম্যাণ্ডারকে দায়িত্ব দিয়ে চলে আসে।

সহকারী কম্যাণ্ডার আরো তীব্র গতিতে আগু বাড়ো বলতে বলতে শত্রুদের বাগানের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যায়। লেন্স কর্পোরেল শুভ্র যখন হামাগুড়ি দিচ্ছিল তখন কর্পোরেল রোমেল মেশিনগান হাতে ছিটকে পড়া শত্রুদের গরু মহিষের মত তাড়িয়ে নিচ্ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ পায়ে গুলি লেগে সে পড়ে যায়। সে তার মেশিনগানের উপর বসে পড়ে রক্তাক্ত কলেবরে। আরো কয়েক ব্রাশ ফায়ার করে সহকর্মীকে ইশারা দিয়ে বলে— এগিয়ে যাও। ততক্ষণে শত্রুদের ২৮ জনের দলটি তাদের আহতদের নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পালাতে শুরু করে। আমাদের রিইনফোর্সটি যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছে তখন শত্রুরা ছত্রভঙ্গ অবস্থায় পালাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বেদখলকৃত জায়গাটি তল্লাসী করে শত্রুদের ফেলে যাওয়া ক্যাপ, ছুরি ও মেশিনগানের গুলির চেইন ও গুলি ভর্তি ম্যাগাজিন দেখে তারা নিশ্চিন্ত হলো এগুলো সবই বাংলাদেশ আর্মি দলের। পরে জানা যায় তিনজন আহতদের নিয়ে ২ মাইল অবধি পালাবার পরই এই আর্মি দলটি তাদের সাহায্যকারী দলকে নাগাল পায় এবং দ্রুত ঘটনাস্থলে ঐ সাহায্যকারী দল পৌঁছে যেতে চেষ্টা করে।

ক্যাপ্টেন ঈশ্বরকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর বিনাবিলম্বে নিরাপদে এলাকায় সরিয়ে নেয়া হলো। দুপুরের খররৌদ্র মাঝে মেঘের আড়ালে রোদের লুকোচুরি খেলা মাঝে চলছিল। আমরা গ্রামের পাশের জঙ্গলে সামান্য সরে গেলাম। বিরাট বিরাট করই গাছের ছায়ায় আহতকে নিয়ে ডাক্তার ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সাধারণ একজন সঙ্গী স্যালাইনটা হাতে ধরে উপরে তুলে রেখেছেন। এই সময় সর্বশেষ সাহায্যকারীদলটি অত্যন্ত সন্তর্পণে ফিরে আসছিল। সঙ্গে দুঃখ ভাব। জিজ্ঞেস করলাম-এত সতর্কতা কেন? তারা জানালো "গতকাল চক্রমা (বিচ্ছেদপন্থীরা) লড়াইয়ে হেরে গিয়ে জনৈক সরকারী এজেন্টের মাধ্যমে আজ আর্মিদের লেলিয়ে দিয়েছে বলে আমরা পাবলিক সূত্রে খবর পেলাম। জানি না জনগণও আমাদের ক্ষতি সাধন করছে কিনা?"

বললাম, জনগণের সবাইতো নয়। নিশ্চয় জাতীয় বেইমানদের দু'একজনের অপকর্ম হতে পারে। ব্যাপক জনগণ তা কখনো ক্ষমা করবে না। তবে একই সঙ্গে আমাদের দুই শত্রুর বিরুদ্ধে যেভাবে লড়তে হচ্ছে তাতে আরো সাবধানতা দরকার।

সবাই মলিন মুখে বসেছে। কারো পেটে ভাত জুটেনি। এমনকি যা সামান্য জল ছিল তাও শেষ হয়ে গেছে। পাড়ায় পুরুষ লোকদের কাকেও পাওয়া যায় না। তারাও যেন মেঘ ও রোদের মধ্যে লুকোচুরি খেলছে।

দুপুর বারোটা গড়িয়েছে। আহত যোদ্ধাটি পানি পান করতে চায়। ডাক্তার পানি দিতে দেন না। কেউ কেউ আপত্তি তুলতে চাচ্ছেন। আহত বন্ধুটি চোখ বুজে শুয়ে আছেন। এমন সময় তার ক্ষতস্থানটি চেক করে দেখলাম একটি গুলি তার তলপেটের নিম্নাঙ্গ ভেদ করে ভেতরে ঢুকে গেছে। মনে মনে চমকে উঠে ডাক্তারকে চোখের ইশারায় জিজ্ঞেস করলাম। ডাক্তার অন্যদের চোখ পর্যন্ত ফাঁকি দেবার চেষ্টা করে ইশারায় জানালেন কোন আশা নেই।

হঠাৎ মনটা নাড়া দিয়ে উঠল। একেত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য কম্যাণ্ডার, কষ্টসহিষ্ণু। দ্বিতীয়তঃ সে স্বদক্ষ

এল এম জি ম্যান। আগেও তার বীরত্বের প্রমাণ আমরা পেয়েছি। কিন্তু তাকে বাঁচাবার কি কোন উপায় আমাদের নেই ?

সবকিছু বিবেচনা করে আহত বন্ধুর হাত ধরে ডাকলাম —রোমেল, তোমার কেমন লাগছে ? অত্যন্ত স্পষ্ট উত্তর—স্যার, আমার জন্য কোন কষ্ট না করাই ভাল হবে। সে ততক্ষণে সামান্য চোখ মেলেছে। হৃদয়ের কষ্ট চাপা দিয়ে বললাম—রোমেল, তোমার কিছু বলার আছে ? সে আগে পানি খেতে চায়।

বিবেচনা করা হলো—তাকে বাঁচাবার বিকল্প কিছুই যখন আমাদের নেই তাহলে তার শেষ ইচ্ছাটায় পূরণ করে দেয়া ভাল। সবাই তাতে একমত হওয়াতেই ডাক্তার একটা কোরামিন ইনজেকশন দেয়ার বদলে পানি দিতে রাজী হলেন। ডাবের পানি দেয়া হলো। অত্যন্ত সামান্য পরিমাণ পেয়েও সে সোজা আমার হাত ধরে বললো—স্যার, আমি দু'জনকে মেরেছি।

তার কণ্ঠ শুনে সবাই আবার তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। সে যতদূর সম্ভব চোখ বড় বড় করে সকলের দিকে তাকিয়ে বললো—ভাইসব, তোমরা পিছপা হওনা। জয় আমাদের হবেই, জয়-জয়-জয় বলতে বলতে তার হাঁ করা মুখে ধীরে ধীরে কণ্ঠ মিলিয়ে গেল এবং দেখতে দেখতে তার নীলাভ দু'টো চোখ সাদা, ফ্যাকাশে সাদা হয়ে এলো। চোখ আধাবোজা অবস্থা থেকে আর বেশী হতে পারলো না।

বিপ্লবের জীবন, ত্যাগের জীবন। কর্পোরেল রোমেল মানুষের সবচাইতে প্রিয় সম্পদ জীবনটা ত্যাগ করল কিন্তু কোন অভিযোগ করলো না। সংসারে তার অসহায় বৃদ্ধ মা বাবা আছেন কারোর জন্য কোন দাবি, কোন আক্ষেপ রেখে যায়নি—তার মুখে শুধু একটাই ঘোষণা জয় আমাদের হবেই ……।

হয়তো সেই জয়, অন্তরেরই জয়। কারণ, একনিষ্ঠ ত্যাগী ব্যতীত সংসারের এত মোহ, মায়া ও স্বার্থ কেউ ত্যাগ করতে পারে না।

তার এই বিদায় এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল যে, অজান্তে কখন সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে কেউ লক্ষ্য করেনি। তার বিদায় মুহূর্তে সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে অথচ কেউ কাকেও অর্ডার দেয়নি, অনুরোধও করেনি। সবাই নির্বাক চিত্তে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। ভাবলাম, এটাই হয়তো শহীদ বীরের প্রতি সাথীদের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে। তারপর সন্ধ্যা। ততক্ষণে বীর রোমেলকে দাফন করার সমস্ত প্রস্তুতি শেষ হয়েছে। তাকে সর্বোচ্চ সম্মান গার্ড অব অনার দেয়ার প্রস্তুতিও শেষ করা হয়েছে। তার যোদ্ধাবেশী দেহের সবকিছুই নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে, কিন্তু তার বুক স্পর্শ করলে তখনো বেশ গরম। তাই সহকর্মীদের চরম আপত্তি তার সমস্ত দেহ ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত তাকে দাফন করতে দেবে না। তার জন্য যত কষ্ট আসুক যত ত্যাগ স্বীকার করার প্রয়োজন হোক—তারা সবকিছুতে প্রস্তুত। তবুও তার প্রতি ভালবাসার, শেষ শ্রদ্ধার দায়িত্ব তারা পালন করবে।

দূরে তখন দ্রুতগামী গাড়ী চলাচলের শব্দ শোনা যাচ্ছিল, পাড়াগ্রামে কুকুরের আওয়াজ। মাঝে মাঝে মানুষের হাঁকডাক। পৃথিবীর সবকিছুই স্বাভাবিক গতিতে চলছে বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু এক ঝাঁক অস্ত্রধারী মানুষ যাদের সারাদিনের জন্য কোন অন্ন জুটেনি, যাদের জন্য কোন হাঁকডাক নেই, কোন ধোয়া মোছার তাগিদ নেই, কোন খাওয়া-দাওয়ার আবদার নেই—ছোট্ট একটা ঝর্ণার ধারে একজন ক্ষুদে বিপ্লবীর লাশকে ঘিরে সেদিনের দুপুর, সন্ধ্যা এবং সমস্ত রাত্রি সময়ের গতিতে চলছিল—কিন্তু অপেক্ষা করছিল সেই মুমূর্ষ সংগ্রামী বন্ধুর অমোঘ উচ্চারণ-"জয় আমাদের হবেই।" বলাবাহুল্য সাফল্য তথা বিজয়ের বাসনা বুকে ধারণ করে সংগ্রামী রথ চালিয়ে যাওয়ায় হচ্ছে প্রতিটি বিপ্লবীর ধর্ম।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বন ধ্বংস ও প্রাকৃতিক পরিবেশ

—শ্রী উত্তম

গভীর বনাঞ্চলে আচ্ছাদিত ছায়ানিবিড় পার্বত্য চট্টগ্রাম আজ বিরান ভূমিতে পরিণত হতে চলেছে। এখানকার শতাধিক বৎসরের সংরক্ষিত বনভূমি গত দু'দশকে প্রায় ধ্বংস করা হয়েছে। বর্তমানেও এখানে বৃক্ষনিধন চলছে অবিরাম গতিতে। এভাবে বৃক্ষনিধন চলতে থাকলে আগামী দু'দশকে সমগ্র এলাকাটি বৃক্ষহীন লতাগুল্ম আচ্ছাদিত অঞ্চলে (Scrub land) পরিণত হবে।

বিগত সত্তর দশক পর্যন্ত দেশের বৃহত্তম বনাঞ্চলটি ছিল এ জেলায়। দেশের মোট বনাঞ্চলের ৫১% ভাগ (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ—১৯০৬, ২৩ পৃষ্ঠা)। এ বনাঞ্চল উত্তর ও দক্ষিণ এ দু'অঞ্চলে বিভক্ত। এ বনাঞ্চলকে আবার ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে।

১) সংরক্ষিত বনাঞ্চল (Reserve Forest)

২) রক্ষিত বনাঞ্চল (Protected Forest)

৩) অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চল (Unclassed State Forest)

এ জেলার ৮০% অঞ্চল বনাঞ্চলে আচ্ছাদিত। বিভিন্ন মূল্যবান বৃক্ষ—গর্জন, জারুল, গামার, শিমুল, চাপালিশ, কড়ই, কনক প্রভৃতি গাছ ও বাঁশই এই বনাঞ্চলের প্রধান সম্পদ। এসব মূল্যবান গাছ ও বাঁশ ছাড়াও এ বনাঞ্চলে বেত, করুপাতা, মধু, শন প্রভৃতি প্রচুর পরিমানে পাওয়া যায়। আর এই প্রাকৃতিক বনভূমি ছিল বিভিন্ন বন্য জীবজন্তুর আবাসস্থল ও জুম্ম জনগণের প্রধান জীবিকার ক্ষেত্র। স্মরণাতীত কাল হতে জুম্ম জনগণ এই বনাঞ্চলে জুমচাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। বিগত পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত ৮০% জন জুম্ম ছিল এই জুমচাষ নির্ভর। বর্তমানেও ৫০% জন জুম্ম এই বনভূমিতে জুমচাষ বনজ সম্পদ আহরণ ও বনজ ফলমূলের উপর নির্ভরশীল। তাই বলতে গেলে বিগত শতাব্দীগুলিতে এই বনভূমি জুম্ম জনগণকে দিয়েছিল স্বাচ্ছন্দ্যময়, স্বচ্ছল ও মুক্ত জীবন।

বনভূমি ধ্বংসের কারণসমূহ ঃ

এ জেলার বনভূমি ধ্বংসের কারণগুলি প্রধানতঃ অর্থনৈতিক হলেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রসূত। অন্যভাবে বলা যায়, জুম্মদের শোষণ ও দমনের বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মধ্যে বনভূমি ধ্বংসের কারণগুলি নিহিত। বনভূমি ধ্বংসের কারণগুলো হলো—

১। **কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ** :—পঞ্চাশের দশকে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার বৃহৎ শিল্পোন্নয়নের অংশ হিসেবে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করলেও জুম্ম জনগণের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়াই ছিল এর অন্যতম উদ্দেশ্য। এ বাঁধের ফলে ২৫৬ বর্গমাইলের কাপ্তাই হ্রদের সৃষ্টি হয়। এতে ৫৪,০০০ একর জমি (মোট জমির ৪০ শতাংশ) ও বিপুল পরিমাণ সংরক্ষিত ও অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চল জলমগ্ন হয়। এ হ্রদের ফলে ১৮,০০০ জুম্ম পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রায় ১ লক্ষ লোককে তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হতে হয়। এই ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের পুনর্বাসনের জন্য ৪৬'৭৫ বর্গমাইল সংরক্ষিত বন খুলে দিতে হয়। বলাবাহুল্য যে, এই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে পুনর্বাসিত অঞ্চলে হারানো জমির অর্ধেক জমিমাত্র দেয়া হয়। ফলে ন্যূনাধিক ৩,০০০ পরিবার জীবিকার্জনের জমি পেলেও বাকী পরিবার (১৫০০০ পরিবার প্রায়) সম্পূর্ণ ভূমিহীন হয়ে পড়ে। এভাবে কাপ্তাই বাঁধ জুম্ম জনগণের আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রভূত পরিবর্তনের সাথে বনভূমির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ক্ষতিগ্রস্ত ও উদ্বাস্তু জুম্মদের পুনর্বাসনের জন্য কাচালং বনাঞ্চলের একাংশ খুলে দিতে হয়। উদ্বাস্তুরা বর্তমান বাঘাইছড়ি, লংগদু, দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি, পানছড়ি, মহালছড়ি, বরকল, জুরাছড়ি, বান্দরবান, রুমা, লামা প্রভৃতি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। তারা এসব এলাকায় অনাবাদী জমি আবাদ করে। এইভাবে ষাটের দশকে কয়েক হাজার একর বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে যায়। তাই কাপ্তাই বাঁধ প্রথমে বনভূমির ধ্বংসে প্রত্যক্ষ ও সুদূরপ্রসারী কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নিম্নে এর একটা পরিসংখ্যান দেয়া গেল।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি (বর্গমাইল হিসেবে)

বনভূমির বিবরণ	কাপ্তাই বাঁধের পূর্বে	জলমগ্ন	ধ্বংস	কাপ্তাই বাঁধের পর
ক) উত্তর বন বিভাগ	৬৭৯·৫০	১৮·০০	৪৪·৫০	৬১৭·০০
খ) দক্ষিন বন বিভাগ	৩২১·৯৯	৪·৩৪	২·২৫	৩১৫·০০
গ) অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চল	৩৪০০·০০	২৩৪·০০		৩১৬৬.০০
ঘ) প্ল্যানটেশন		১০·০০	২·২৫	

(পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা গেজেটিয়ার, ১৯৭৫ ৯০-১০০ পৃষ্ঠা)

২। জুমচাষ ও বাগানকৃষি :— বিগত তিন দশক আগে জুমচাষ ছিল জুম্মদের প্রধান জীবিকা। এই জুমক্ষেত্রে বনভূমিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়। তাই এ জুমকৃষি বনভূমিক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ। তবে অশ্রেণীভুক্ত বনাঞ্চলে বিভিন্ন ফলের বাগান করা হচ্ছে। এভাবে অশ্রেণীভুক্ত বনাঞ্চল দিনদিন হ্রাস পাচ্ছে ও বর্তমানে এই বনাঞ্চল লতাগুল্মের আচ্ছাদিত বনাঞ্চলে পরিণত হয়েছে।

৩। অনুপ্রবেশ ও পুনর্বাসন :— বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর সমতল জেলা হতে প্রচুর লোক পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ করে। এ অনুপ্রবেশের ফলে এ জেলার জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং এ জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ সর্বপ্রথম বনভূমির উপর পড়ে। ফলে বসতি-স্থাপন, অনাবাদী জমির আবাদ ও বনজ সম্পদের আহরণের ফলে প্রচুর বনাঞ্চল ধ্বংস হতে থাকে। এছাড়া ১৯৭৮—১৯৮৫ সাল পর্যন্ত সরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন ধারায় লক্ষাধিক বাংলাদেশী মুসলিম পরিবারকে এ জেলায় অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়। এ অনুপ্রবেশকারীরাও একইভাবে বনভূমি ধ্বংস করতে থাকে। একত্রে কানাডার দু'জন বন বিশেষজ্ঞের মত প্রণিধানযোগ্য।

Because of natural population increase, immigration of plains people and the loss of land to the Karnaphuly Reservoir, the pressure on land has become so intense in recent years that not only the Jhum cycle has decreased but serious encroachment into the Reserved Forest is taking place.

(Report on Forestry Sector—by W. E. Webb, ADB consultant, Forestal International Ltd. Vanoconver, Canada and R. Roberts, Forestry Advisor, C.I.D.A. Ottawa, Canada)

উল্লেখ্য যে, জুম্মদের জনাধিক্যতা হ্রাস ও অনুকূল জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার পরিকল্পিতভাবে এ অজুম্মদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। উদ্দেশ্যটা রাজনৈতিক বটে। কিন্তু এর বিরূপ প্রভাব পড়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর। এই অনুপ্রবেশকারীরা বিশেষভাবে তাদের আশেপাশের সমস্ত বনজ গাছ বাঁশ কেটে উজার করে। এমনকি সরকারী প্ল্যানটেশন ও জুম্মদের বাগ-বাগিচা সবই ধ্বংস করে দেয়।

৪। কাঠ আহরণ :— বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ব্যাপকহারে সরকারী ও বেসরকারী উভয় উদ্যোগে এই কাঠ আহরণ করা হচ্ছে। কিন্তু এই অপরিকল্পিত কাঠ আহরণের ফলে জেলার বনভূমি দ্রুত উজার হতে চলেছে। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত অধিকাংশ সেনা কর্মকর্তাদের ছত্রছায়ায় এবং অসাধু বনকর্মী ও স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় অসাধু কাঠ ব্যবসায়ীদের কাঠ আহরণ, বনভূমি ধ্বংস ও পরিবেশের ভারসাম্যতা নষ্ট হওয়ার হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে বিগত কয়েক বৎসর যাবত দেশের বিভিন্ন পত্রিকায় রীতিমত সংবাদ প্রকাশিত হয়ে আসছে। নিম্নে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি খবরের হেড লাইন দেয়া গেল।

(১) বান্দরবানের বনাঞ্চলের বন সাবাড়

দৈনিক ইনকিলাব, ১০ই জুলাই, ১৯৯১ ইং

(২) সেগুন গাছ নিধন অব্যাহত
বনভূমি বিরান ভূমিতে পরিণত হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।

দৈনিক পূর্বকোণ, ২৩ ডিসেম্বর/৯২

(৩) অবাধে কাঠ পাচার,
পার্বত্যাঞ্চল এখন বৃক্ষশূন্য।

আজকের সূর্যোদয়, ১৬-২২ সেপ্টেম্বর/৯৩

(৪) নির্বিচারে বৃক্ষনিধন। প্রাকৃতিক পরিবেশ বিপন্ন হওয়ার উপক্রম, বনবিভাগ নির্বিকার

সাপ্তাহিক পার্বতী—২১ জানুয়ারী/৯৪

(৫) মানিকছড়ি বনে বৃক্ষনিধন

দৈনিক পূর্বকোণ, ৩ ফেব্রুয়ারী/৯৪

(৬) বনাঞ্চলে কাঠ পাচারকারীদের রাজত্ব

দৈনিক পূর্বকোণ, ৫ এপ্রিল/৯৪

(৭) বাঘাইছড়ির বনাঞ্চল উজাড়

দৈনিক পূর্বকোণ, ১৯ এপ্রিল/৯৪

এসব প্রতিবেদন হতে জানা যায় যে, প্রতিদিন ট্রাকে করে হাজার হাজার ঘনফুট সেগুন, কড়ই, গামার ইত্যাদি কাঠ, বল্লী ও রদ্দার আকারে অন্য জেলায় পাচার করা হচ্ছে। এ সমস্ত কাঠ অবৈধভাবে বেশী পাচার হচ্ছে। এতে অত্যন্ত অপরিকল্পিতভাবে বৃক্ষনিধন চলছে ও সরকারও রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ সমস্ত প্রতিবেদনে এ অবাধ বৃক্ষনিধনের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাকৃতিক পরিবেশ বিপন্ন হওয়ার আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে।

৫। বিদ্রোহ দমনের কলাকৌশল : (Anti-insurgency tactics) : পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গৃহীত বিদ্রোহ দমনের কৌশলই বর্তমানে এ জেলার বনাঞ্চল ধ্বংসের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে স্তব্ধ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় চারশত সেনা ক্যাম্প স্থাপন করেছে। এসব ক্যাম্পগুলির মধ্যে দুইশত পঞ্চাশ এর অধিক ক্যাম্প সংরক্ষিত ও অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত। শান্তি-বাহিনীর আকস্মিক আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এসব ক্যাম্পের চারিদিকের ৫০০ গজ বনাঞ্চল ধ্বংস করা হয়। এছাড়া ক্যাম্পের মধ্যেকার যোগাযোগের রাস্তা ও সারা পার্বত্য চট্টগ্রামের সেনা চলাচলের রাস্তার দু'ধারেও বনাঞ্চল ধ্বংস করা হয়। অধিকন্তু গ্রীষ্মকালে বিভিন্ন অঞ্চলে অগ্নিসংযোগ করে সরকারী সেনারা বনাঞ্চলের প্রভূত ক্ষতি-সাধন করে থাকে।

আরো উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত অনেক উচ্চ পদস্থ সেনাকর্মকর্তারা অবৈধভাবে মূল্যবান কাঠ আহরণ ও কাঠ পাচারে জড়িত। এ ক্ষেত্রে ১৯৮০-৮২ সনে মাইনীমুখ ক্যাম্পের (সংগঠ) জনৈক কর্ণেল এর কাঠ পাচার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বলাবাহুল্য যে, ভূমণ্ডলের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার্থে প্রাকৃতিক বনভূমির ভূমিকাই সর্বাধিক। এই বনভূমির ব্যাপক ধ্বংসই আজকের বিশ্বের পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা অন্যতম কারণ। আর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদদের মতে যেকোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন দেশের ২৫ শতাংশ বনভূমি। দেশের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা ছাড়াও দেশের বন্য পশুপক্ষী সংরক্ষণ, শিল্পে কাঁচামাল যোগান, মানুষের নিত্য ব্যবহার্য আসবাবপত্র, জ্বালানী কাঠের সরবরাহের প্রধান উৎস হচ্ছে বনভূমি। পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি বর্তমানে দেশের বিপুল পরিমাণ কাঠের চাহিদা পূরণ করছে ও এটি কর্ণফুলী পেপার মিলে ব্যবহৃত বাঁশের একমাত্র উৎস। তাছাড়া এ বনভূমির ৫০% জুম্ম জনগণের জীবিকার প্রধান উৎস বটে। তাই এই বনভূমির ধ্বংস অনিবার্যভাবে জুম্মদের জীবনে বেকারত্ব ও চরম দারিদ্রতা নিয়ে আসবে ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতা ঘটাবে। ইতিমধ্যে বনভূমি ধ্বংসের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের বার্ষিক বৃষ্টিপাত ও উষ্ণতার কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। নিম্নের সারণীতে তা দেখানো হল।

বার্ষিক তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত (রাঙ্গামাটি, ১৯৭৫-৯০ইং)

বৎসর	'৭৫	'৭৬	'৭৭	'৭৮	'৭৯	'৮০	'৮১	'৮২
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (সেঃ)	৩৭°৪	৩৬°৫	৩৬°৩	৩৭°০	৩৮°৭	৪০°৩	৩৫°৫	৩৯°০
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (সেঃ)	১২°৮	১২°৪	১১°৭	১০°০	০৬°১	১৩°৯	১১°৫	১৪°৪
বৃষ্টিপাত (মিঃ মিঃ)	৩০৩০	২৫৪৮	২৩৭৩	২৬০৪	৩২৯৩	২৪৬৬	১৮৬৩	

(চলমান)

বৎসর	'৮৩	'৮৪	'৮৫	'৮৬	'৮৭	'৮৮	'৮৯	'৯০
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (সেঃ)	৩৫°২	৩৬°৬	৩৬°০	৩৭°৪	৩০°১	৩৩°৪	৩০°১	৩৩°১
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (সেঃ)	০৮°৩	১০°০	১২°৫	১২°৫	২১°১	১৯°১	২০°৯	১৭°৬
বৃষ্টিপাত (মিঃ মিঃ)	২৯৬৬	২২০৬	১৮৩৬	২৪৪২	২৯৯০	৩০৪৩	২৫৯৫	২৬৮১

সারণীতে বিগত ১৫ বৎসরের বার্ষিক তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। বার্ষিক তাপমাত্রা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১০°২ সেঃ (৩০°১-৪০°৩) পর্যন্ত উঠানামা করেছে। অন্যদিকে সর্বনিম্ন বার্ষিক তাপমাত্রা ১৪°৭ সেঃ (৬°১—২০°৮) পর্যন্ত পরিবর্তন ঘটেছে। তবে উভয় ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, তাপমাত্রা প্রায়ই ঊর্ধ্বমুখী হারে পরিবর্তিত হয়েছে।

অনুরূপভাবে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের মাত্রা নিম্নমুখী বলা যায়। ১৯৭৬ সালকে ভিত্তি বছর ধরলে বৃষ্টিপাতের এই নিম্নমুখীতা স্পষ্ট হয়ে উঠে। কৃষকদের বাস্তব অভিজ্ঞতাও তাই বলে। তাদের মতে পূর্বের চেয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক কমে গেছে। অবশ্য বিগত ১৫ বৎসরের বার্ষিক তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত দিয়ে জলবায়ুর পরিবর্তন পরিমাপ করা বিজ্ঞানসম্মত নয়। এর জন্য প্রয়োজন ৩০-৫০ বৎসরের তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের তথ্য। তবুও কৃষকদের অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়—বনভূমি ধ্বংসের কারণে এ জেলায় জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে।

একটি সংগ্রামী মনের অভিব্যক্তি

—শ্রী সুপ্রিয়

একটি ছোট্ট ঘটনা দিয়েই লেখাটা শুরু করা যাক। তখন গ্রীষ্মকাল। দম আটকে যাবার মত প্রখর দাবদাহ চলছে। প্রায় প্রতিটি দিন 'রাঙার' প্রকাশনা বিক্রি করতে ঢাকার রাজপথ আর অলিগলিতে জুম্ম চাকুরীজীবিদের বাসায় যাওয়া হত। এমনি একদিন মহম্মদপুরস্থ এক স্বচ্ছল জুম্ম পরিবারের বাসায় কলিং বেল বাজান হল। ভেতর

থেকে কাজের মেয়ে উঁকি দিয়ে পরিচয় আর আগমনের কারণ জানতে চাইল। নিজেদের পরিচয় আর উদ্দেশ্য জানান হল। কাজের মেয়েটি অন্তঃপুরে গিয়ে খবর দিয়ে ফের এসে বলল বাবু নেই। বলা হল বাবু না থাকলে গৃহকর্ত্রীর সাথেও প্রয়োজনীয় আলাপ করা যাবে। মেয়ে ভেতরে গেল। সাড়া পাওয়া গেল না অনেকক্ষণ। গেইটের বাইরে নির্বিঘ্নে বিশ মিনিটের মত পার হল। অবশেষে গৃহকর্ত্রী দরজা খুলে সৌজন্যের হাসি সহ বসতে বলে ভেতরে প্রবেশ করলেন। আভিজাত্যে ঠাসা ওয়েটিং রুমের মখমলে সোফায় বসে অতিরিক্ত আরো পনের মিনিটের সময় অতিক্রমের পর গৃহকর্ত্রীর আবির্ভাব হল। জিজ্ঞেস করা হল চা খাওয়া হবে কিনা। দু'সংখ্যার 'রাডার' সংকলন হাতে দিয়ে সবিনয়ে বলা হল, 'চা খেলে দেরী হবে। সাধ্যানুযায়ী আর্থিক সহায়তা পেলে বেরুতে হবে আবার।'। আর্থিক সাহায্যের কথা শুনে কেমন একটা শুকনো হাসি দিয়ে উনি ফের ভেতরে গমণ করে আর ফিরলেন না। কাজের মেয়ের হাতে পাঁচ টাকা দিয়ে পাঠালেন। মুহূর্তে তীব্র ক্ষোভ আর ঘৃণা মোচড় দিয়ে গেল। ঐ বাসায় যাওয়া আসার রিক্সা ভাড়া হিসেব করে মেজাজ বিগড়ে যাবারই কথা। নির্মম একটা যন্ত্রণা হজম করে বেরিয়ে আসতে হল সেদিন। সে ঘটনা শুনে বন্ধুরা কম রসিকতা করেনি। ওরা বলত "মাত্র পাঁচ টাকার সংগ্রামে অংশগ্রহণ"। গৃহকর্ত্রী শুধু ভালো চাকুরেওয়ালার বউ নয় নিজেও ধনী ঘরের উচ্চ শিক্ষিতা কন্যা অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করা মহিলা। প্রসঙ্গতঃ একটি তুলনামূলক উদাহরণ স্মরণ করা যেতে পারে যেমন রাঙামাটি স্বনাম ধন্য এম পি যিনি সুযোগ পেলে জাতিগত নিপীড়ন নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহস করেন এবং যিনি মানবিক মূল্যবোধ ও মানবিক অধিকার সম্পর্কে তুখোড় বক্তব্য প্রদানে জীবন বাজি রাখার ইচ্ছে প্রকাশ করেন, তিনি তাঁর ঘরে 'রাডার' সংকলন রাখতে সাহস করেন না—অহেতুক ভয় পান। পক্ষান্তরে মহালছড়ি থানার এক অজপাড়া গ্রামের অখ্যাত জনৈক জুম্ম 'রাডার' সংকলন কিনে বাড়ী ফিরছিলেন। বাজারের সন্নিকটের আর্মী চেক পোষ্টে 'রাডার' কেনার খেসারত হিসেবে তাকে কিল, লাথি, ঘুষির অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। আর্মীরা তাকে 'রাডার' না কেনার কথা বললে সে বলে "মাড'ার হলেও 'রাডার' কিনবো"। অত্যাচারের মধ্যেও গ্রামের সরলপ্রাণ এ মানুষটি সংগ্রামে অটল থাকেন। এই হল জুম্ম জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের সংগ্রামে জুম্ম সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অংশগ্রহণের মানসিকতা, সংগ্রামী হবার মাত্রা।

জনসংহতি সমিতির আপোসহীন নেতৃত্বে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের চলমান আন্দোলনের বয়স দুই দশক পার হয়ে গেল। জুম্ম জনগণের আন্দোলনের ইতিহাসে অসংখ্য ঘটনা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। ধর্ষণ, অত্যাচার, নির্যাতন, হত্যা, গণহত্যায় রক্তাক্ত কাহিনী রচিত হয়েছে অনেক। নিপীড়ক বাংলাদেশ সরকারের লেলিয়ে দেয়া সেনাবাহিনীর দমন পীড়নের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ক্ষুদ্র জুম্ম জাতিসত্তার বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল নিপীড়নের মাত্রা চূড়ান্ত পর্যায়ে। অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের প্রতিবাদী চৈতনার বিকাশ রয়ে গেছে সীমিত। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রামে অধিকতরভাবে সামিল হবার মানসিকতা রয়েছে সংকীর্ণ। সংগ্রামে অংশগ্রহণের মাত্রা শুধু নগন্যই নয়, নিন্দনীয়ও বটে। জোরালোভাবে সংগ্রামকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসেনি শিক্ষিত জুম্ম সমাজ। এমনকি সাহসের সাথে নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামও গড়ে তুলতে পারেনি অনেকদিন। বরং সুবিধাবাদী দালালরা জন্ম নিয়েছে নির্বিঘ্নে। দালালী রাজনীতির যে ধারাটিকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা আন্দোলনে চরম বিরোধীতা করে চলেছে আর প্রতিক্রিয়াশীল এই অংশটি সুবিধাবাদের সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উপরে উঠে গেছে। স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের শাসনামলে দালালীপনার আশ্রয়—পার্বত্য জেলা পরিষদকে পাকাপোক্ত করার অপচেষ্টা চলতে থাকে। তখন পার্বত্য জেলা পরিষদ টোপ গিলে যারা আন্দোলনের চরম বিরোধীতায় নেমেছিল তাদের অবস্থাও ভাল থাকার কথা নয়। জুম্ম জাতীয় আন্দোলনের মূলধারাকে পাশ কাটিয়ে পার্বত্য জেলা পরিষদের টোপ গিলে যারা সমস্যা সমাধানে এক ধাপ এগুনোর গালভরা আত্মতুষ্টির কথা বলে দিবা স্বপ্ন দেখেছিল তারা সেই টোপ হজম কিংবা বমি কোনটাই করতে পারছে বলে এখন

মনে হয় না। সরকার ও জন সংহতি সমিতির মধ্যেকার চলমান সংলাপের কারণে এই পার্বত্য জেলা পরিষদ ব্যবস্থাকে জাতীয় সংসদে বারংবার এমেণ্ডমেণ্ট বা সংশোধনীর স্যালাইন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। তবে তার অর্থ এই নয় যে লেজুড়বাদী এই ধারাটির ক্রমেই অপমৃত্যু ঘটতে যাচ্ছে। দালালীবৃত্তিকে বেশ্যাবৃত্তির সাথে তুলনা করা হলেও সমাজের সুবিধাবাদী শ্রেণীটি এ পেশায় যায় বা এই পথে যাবার সাহস পায়। জনগণের মধ্যে ব্যাপক মাত্রায় সংগ্রামী মানসিকতা না জন্মালেই এ শ্রেণীটি সুযোগ পায়। কাজেই ব্যাপক জনগণকে অধিকতরভাবে আন্দোলনে সমবেত করার মাধ্যমেই এই আপোসকামী ধারাটির মোকাবেলা করা যায়। তবে আশার বিষয় যে, উননব্বুইয়ের লংগদু গণহত্যার রক্তাক্ত ঘটনার প্রতিবাদে জুম্ম ছাত্র সমাজের মধ্যে যে ঐক্যবদ্ধ জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে সেটার প্রভাব এখনো যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের লড়াকু নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগঠিত হওয়াতে সুবিধাবাদী আপোসকামী ধারাটি কিছুটা হলেও মুখ থুবড়ে পড়েছে। উননব্বুই থেকে চুরানব্বই আন্দোলনের ক্ষেত্রে খুব বেশী সময়ের ব্যাপার নয়। তবুও জুম্ম ছাত্র সমাজের ভেতর আন্দোলনকামী মনোভাব গড়ে উঠেছে দ্রুত। ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেয়ার মাত্রা ক্রমশঃ বেড়েছে। স্বাভাবিক কারণে জুম্ম জনগণের মধ্যেও যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। রাজপথের আন্দোলন অনেকটা তুঙ্গে উঠলেও ইদানিং প্রতিক্রিয়াশীল চক্র মাথা চাড়া দিতে চাচ্ছে। আন্দোলনের সাথে সাথে ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনা থেকেই যায়। যে কোন একটা পর্যায়ে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে চরম আকারে। সেনা সন্ত্রাসের অতন্দ্রপ্রভুরা এতদিন অস্ত্র বিরতির সুবাদে কিছুটা ঘাপটি মেরে থাকলেও সম্প্রতি তারা খোলাখুলি ভাবে তৎপর হয়েছে। শান্তিবাহিনী যথাযথভাবে অস্ত্র বিরতি পালন করলেও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তার কোন তোয়াক্কা করছে না। বিরতিহীন সামরিক অভিযানের পাশাপাশি হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন অব্যাহত রেখেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সেনা কম্যাণ্ডাররা 'জন সভায় লাঠি চার্জ নয়, লাঠি চার্জ করেই জোরপূর্বক জন সভা' এই কৌশলে পাঁচদফার সমালোচনায় প্রচারাভিযানে নেমেছে। ঠিক এমনি সময়ে সুবিধাবাদী দুলা গোষ্ঠীও সক্রিয় ভূমিকা নিতে শুরু করেছে। বিজু পরবর্তী সময় থেকেই মূলতঃ এই প্রতিক্রিয়াশীল অংশটি প্রকাশ্যে আন্দোলনের বিরোধীতায় নেমেছে।

অপরদিকে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। সেটি হচ্ছে দেশী-বিদেশী সমর্থন পুষ্ট কতিপয় চিহ্নিত দুষ্টচক্র আর্থিক সাহায্য দিয়ে জুম্ম আন্দোলনে বিভেদ ও বিভ্রান্তি ছড়াতে চেষ্টা করছে এবং প্রগতিশীল ছাত্র সমাজের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদীদের গড়ে তুলছে আর এসব প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদীরা মহান সমাজ সেবকের আলাখেল্লা পরে এরা সমাজের কথিত ভদ্র, আমলা, বুদ্ধিজীবিদেরও মাথা গুলিয়ে দিচ্ছে। এমন কি জুম্ম সমাজের অনেক বুদ্ধিজীবিও অর্থের বিনিময়ে তাদের মূল্যবান মেধা, এমন কি চরিত্রও বিকিয়ে দিচ্ছে। ধর্মাশ্রয়ী সমাজ সেবার সাইন বোর্ড দিয়ে এই কুচক্রী মহল নির্বিঘ্নে সকল অপকর্ম চালিয়ে যাবার সুযোগ করে দিচ্ছে। জুম্ম ছাত্র সমাজের একটা অংশ সামান্য আত্মকুল্যের লোভে নিজস্ব সত্তা বিসর্জন দিয়ে জুম্ম জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্তকরণে সহায়তা করছে।

জাতীয় জীবনে তথা সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনে শিক্ষিত সচেতন অংশের সক্রিয় ভূমিকার কোন বিকল্প নেই। সংগ্রামের ইতিহাসে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে তাই জুম্ম ছাত্রদের অধিকতর ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসাটা অপরিহার্য। তাই চল্লিশ দশক, ষাট দশক, সত্তর দশক কিংবা আজকের নব্বই দশক, অতীত থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত শিক্ষিত ছাত্র যুবকরাই আন্দোলনে, সংগ্রামে সর্বাধিক ভূমিকা পালনকারী হিসেবে প্রমাণিত হয়ে আসছে। বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন এগিয়ে নেবার দায়িত্বও তাদের বেশী। আজ তাই পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে এক দুর্বার আন্দোলন। স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ জুম্ম জনগণের কাছে এ সময়ের ছাত্র সমাজের আন্দোলন নানাভাবে প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। ফলতঃ জুম্ম জনগণ দিন দিন জুম্ম ছাত্র সমাজের ভূমিকা নিয়ে আশান্বিত হয়ে উঠছে। তাই

জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রামে নূতন প্রজন্মের ছাত্র-যুব সমাজ অধিক হারে অধিকতর সংগ্রামী চেতনা নিয়ে সমবেত হবে এটাই আজ সময়ের দাবী।

অথচ ইহা হতাশাব্যঞ্জক হলেও অত্যন্ত বাস্তব যে আজকে শিক্ষিত ছাত্র-যুব সমাজ হতাশা-নিরাশায় সংগ্রাম বিমুখতায় ভুগছে। ছাত্র আন্দোলনের বিকাশ দ্রুত হলেও অধিকাংশই প্রকৃত সংগ্রামী হতে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে ছাত্র সমাজের মধ্যে যারা মরিয়া হয়ে স্বায়ত্বশাসনের জন্য আন্দোলন করছে তাদের মধ্যেও এ মিথ্যে ধারণা জন্ম লাভ করছে যে—রাজপথের আন্দোলনই স্বাধিকার অর্জনের পক্ষে যথেষ্ট ও একমাত্র সঠিক পথ। কিন্তু এটি যে একটি বাস্তবতা বর্জিত অলীক ধারণা তা অনুধাবনে ছাত্র সমাজের মধ্যে যথেষ্ট দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। ছাত্র আন্দোলন নিঃসন্দেহে একটি অন্যতম শর্ত হলেও চূড়ান্ত বিজয় অর্জনে তা কেবলমাত্র সহায়ক ভূমিকা রাখতেই সক্ষম।

নূতন করে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে শিক্ষিত ছাত্র-যুব সমাজের এক বিরাট অংশ হতাশা নিরাশার দোলাচলে দুলছে। বিশেষতঃ শহুরে এলাকায় মদ আর জুয়ার নষ্ট চক্রে মানসিক শান্তি খুঁজতে গিয়ে অনেক যুবক অবনতির রসাতলে তলাচ্ছে। চাকরীই শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য যারা মনে করে তারা চাকরীর এই দুর্মূল্যের বাজারে অদৃষ্টকে অভিশাপ দিয়ে মরছে। ছাত্রদের মধ্যেও একগাল সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে স্মার্টনেস কিংবা মদের আসরে নিয়মিত উপস্থিত থেকে নিজেকে কাল্‌চার্ড কাল্‌চার্ড ভাববার প্রবণতা বেড়েই চলেছে। যুব সমাজের এই অপাংক্তেয় অংশের সংগ্রামে অনীহা অত্যন্ত প্রবল। এরা নিজেরাই পরিবর্তনের সংগ্রামে অথর্ব বিকলাঙ্গ বরঞ্চ অন্যদেরও আসক্তির মোহে ডুবাতে চায়। বিভিন্ন অপকর্ম করে সমাজে পঁচন ধরানোর ভূমিকায় তারা তৎপর। শিক্ষিত বেকার যুবক যারা আর কোন ভাল কাজ করার পথ দেখেন না তারা এ পথেই একটা প্যারালাইজড্ জীবন কাটায়।

একজন উচ্চ শিক্ষিত ছাত্র যিনি আন্দোলনের পথ থেকে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে কিংবা একজন নীরব সমর্থক হিসেবে ছাত্রত্ব শেষ করে সে সাধারণতঃ চাকরীর পেছনে হন্যে হয়ে ঘুরে মরে। চাকরী না পেলে ছোটখাট ব্যবসা, প্রাইভেট টিউশনি কিংবা বে-সরকারী স্কুলে শিক্ষকতার পেশা নিয়ে নিরুপদ্রপ সাদামাটা জীবন বেছে নেয়। কলেজ কিংবা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যারা সরাসরি আন্দোলনের কাজ কর্মে কিছুটা সম্পৃক্ত থাকে তারাও শিক্ষার পাঠ চুকাতে না চুকাতে চুপসে যায় আর জীবন সংগ্রামে মুখোমুখী হতে সহজতর পথ খোঁজে। এমন কি যারা জুম্ম জাতীয় স্বার্থ রক্ষার আন্দোলনে সক্রিয় থাকে তাদের মধ্য থেকেও অধিকাংশের চূড়ান্ত সংগ্রামে সামিল হবার প্রবণতাও দুর্ভাগ্যজনকভাবে হতাশাব্যঞ্জক। স্বার্থের মোহ থেকে বেরিয়ে আসতে ব্যর্থ হয়। চোখ বুজে উট পাখীর মত সমস্ত অন্যায় অত্যাচার থেকে রেহাই পেতে চায়। হতাশা নামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে নিজেকে বা অন্য কাউকে ধিকার দিতে থাকে আর যাক সর্বস্ব বিপ্লবীর মত বৈঠকখানার রাজনীতি চর্চা করে থাকে। পক্ষান্তরে সরকার ও তার সশস্ত্রবাহিনীর নির্যাতন, নিপীড়ন ও শোষণ দেখে পীড়িত হয়ে উঠে। তখন মনে মনে ভাবতে থাকে সংগ্রামী-প্রতিবাদী হয়ে কিছু করার, কিন্তু তার স্বার্থপরতা ও ভীরুতা তাকে পশ্চাতে ঠেলে দেয়।

প্রসঙ্গতঃ প্রশ্ন জাগে এর পিছনে সমস্যাটা কোথায়? প্রকৃত পক্ষে সমস্যা কোথাও নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামে যখন কোন হত্যা, ধর্ষণ, গণহত্যার মত দুর্ঘটনা সেনা বাহিনী ঘটায় তখন সকলেই কষ্ট পায়, ক্ষুব্ধ হয়। বিলাপ করে থাকে—'এবার বুঝি দেয়ালে পিঠ ঠেকল'। অথচ এটি একটি কথার কথা মাত্র। বাস্তবে সকল শোষণ-বঞ্চনার অবসানের লক্ষ্যে আজো মরণপণ মোকাবেলা করার কোন চেষ্টাই করা হয়নি। খাগড়াছড়ি বাসীর উপর যদি আক্রমণ পরিচালিত হয় তবে শুধু তাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকলেই চলবে না। রাঙামাটি ও বান্দরবানবাসী জুম্মদেরও দেয়ালে পিঠ ঠেকতে হবে। অথচ অদ্যাবধি সেরকমটি হয়নি। যে অঞ্চলের অধিবাসীরা অত্যাচারিত হয়েছে একমাত্র তাদেরই দেয়ালে পিঠ ঠেকেছে। অপরাপর

অঞ্চলের বাসিন্দাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকার চেতনার উদয় হতে পারেনি। নিজের উপর যতক্ষণ না পর্যন্ত নির্যাতন এসেছে ততক্ষণ নীরবে নিভৃতে থাকার চেষ্টা করেছি। অর্থাৎ স্বার্থের উপর আঘাত না আসা পর্যন্ত দেয়ালে পিঠ ঠেকে না। সত্তোর থেকে চুরানব্বই। দুই যুগের অধিক আমাদের সংগ্রামের ইতিহাস। নেহায়েত কম নয়। একটি পশ্চাদপদ সংখ্যালঘু জুম্ম জনগোষ্ঠীর এত দীর্ঘ লড়াই পরিচালনা করা যথেষ্ট কঠিন। এভাবে দেখতে দেখতে দু'হাজার সালের সীমানাও পার হয়ে যাবে একদিন। অথচ ঐ কল্পিত দেয়ালে আমাদের পিঠ ছুঁবে না। কারণ ঐ দেয়ালের আগে সুবিধাবাদের, দালালী-পনার স্বার্থের যে দেয়াল রয়েছে সেগুলিই আগে ভাঙা চাই। শিক্ষিত ছাত্র যুব সমাজের চরিত্রের মধ্যেই এ দুর্মনীয় প্রাচীর লুকিয়ে আছে। ফলতঃ শেষ পর্যন্ত শিক্ষিত ছাত্র-যুব সমাজ অনেকটা স্বার্থ ত্যাগ করতে পারলেও চূড়ান্ত ক্ষেত্রে তারাও লুকিয়ে থাকা স্বার্থের আবর্ত থেকে বেরুতে পারে না। কারণ তাদের চরিত্রের ভেতরেও নিভৃতে লালিত হয় সামন্ত বা পেটি বুর্জোয়া মানসিকতা। ফলে নিজের মধ্যেই সংঘাত বাধে। সংঘাতে যারা নিজেকে জয়যুক্ত করবে তারা অবশ্যই সংগ্রামে এগিয়ে যাবে। অধিকতরভাবে সামিল হবে আন্দোলনে সে পথ যত কঠিনই হোক না কেন।

সময় অনেক গড়িয়েছে। জুম্ম জাতীয় জীবনে দুর্যোগ বয়ে গেছে বহু। শিক্ষিত ছাত্র-যুব সমাজকে তার ঐতিহাসিক দায় দায়িত্ব পালন করতে আরো মারমুখী হতে হবে। সমাজের অগ্রগামী শিক্ষিত অংশকে জাতীয় দুর্দিনে অবশ্যই ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধে থাকতে হবে। এ মুহূর্তে তারাই অপেক্ষাকৃত সংগঠিত শক্তি। কাজেই এ শক্তির সমাবেশ ঘটাতে হবে। জুম্ম জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের লড়াইয়ে। নুতন প্রজন্মের তরুণ সমাজ যে পরিমাণে আন্দোলনে সক্রিয় হবে সেভাবেই বিজয় অর্জনের দিকে আমরা এগুতে পারবো। পুরাতনের অভিজ্ঞতা আর নুতনের উদ্যোগ ও সাহসী শক্তির সম্মিলন অবশ্যই জরুরী। বলা বাহুল্য ষাট দশক ও সত্তোর দশকের গোড়ার দিকে ছাত্র ও শিক্ষিত মহলের যে অংশটি স্বায়ত্বশাসনের ডাক দিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করেছিল সে অংশটি আজো কঠোর আত্মত্যাগের ভেতর এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মূল আন্দোলন। শত ঘাত প্রতিঘাত উপেক্ষা করে যে সংগ্রাম চলছে তাকে আরো বেগবান করে গড়ে তুলতে তথা বিজয় অর্জনে এগিয়ে যেতে শিক্ষিত ছাত্র-যুব সমাজের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে অধিকতরভাবে সমাবেশ ও সামিল হওয়া একান্তই জরুরী ও অপরিহার্য।

পথের দিশারী

—শ্রী কিশোর

হে বান্ধববৃন্দ! রহ চির জাগ্রত প্রহরী
ভালবাস সবে স্বদেশ জনমভূমি
ভালবাস মন প্রাণে স্বজন স্বজাতি
জাতির মঙ্গলে ছাড়ি গৃহ পরিজন
করেছ বরণ দুঃখ দুঃসহ অতি।
পাতার কুটিরে বন গাছের তলায়
ছিল তোমাদের আশ্রয়

রাতের আঁধারে জ্বালি তারকা প্রদীপ
ছিলে অরণ্যে নির্ভয়।
বনে বনে রহি সবে বনের প্রবাসী
সাধিলে যুগের সাধনা
জাতির কল্যাণে গৃহ ছাড়া পথ বাসী
করিলে মঙ্গল কামনা।
মানবতা নীতি ধর্ম শোভিত সুন্দর

১০ই নভেম্বর '৮৩ স্মরণে

ধন্য তোমাদের জীবন
জাতির কল্যাণে সবে আপন জীবন
হাসিমুখে দিলে দান :
নিরাশায় ভরসা দানি জাতির মানসে
ছিলে জাতির সহায়
আজি এ দুর্দিনে হে ! জাতির মহান বন্ধু !
হারিয়ে গিয়াছ হায় !
তোমাদেরে হারাবে তা'ত নাহি মানে মন
অদেখা আড়ালে বুঝি রয়েছ গোপন।
যুগ যুগ ধরি পথের দিশারী ওই—
ধ্রুবজ্যোতি জ্বলে ওই জ্যোতির ভুবনে
তেমনি উজালি জাতির হৃদয় আকাশ
চিরদিন জ্বলিবে সবে জাতির স্মরণে।
হে : পথের দিশারী বান্ধববৃন্দ !
জীবনের ভীড়ে উচ্চে তুলিয়া নিশান
যুগে যুগে দিও বন্ধু পথের সন্ধান।

বিভেদপন্থী সুরতনীদের উদ্দেশ্যে ছড়া ও কবিতা

—শ্রীমতী নাক্যবি

(১)

এক যে ছিল ল্যাংরা
শরীর ছিল তার ঢ্যাংরা,
হতে গিয়ে চ্যাংরা
হলো তবে আঙরা।

(২)

এক যে ছিল লাম্বু
দিচ্ছিল সে বাম্বু,
নিজেই হলো ঠাণ্ডা
খেয়ে এক ঘা ডাণ্ডা।

(৩)

ভণ্ডামিতে পাকা
ভণ্ডামিতে পুরস্কার,
দেবেন মশায়
পেয়ে গেছে অকা।

(৪)

চাকা সে চক্র
বাঁকা সে বক্র,
করতে গিয়ে চক্রামি
শুরু করে বক্রামি।
চক্রামি আর বক্রামি
সব মিলে ভণ্ডামি।
বলে 'দেশ পরাধীন
তিন মাসে স্বাধীন।'
এই তার তন্ত্র
দ্রুত নিষ্পত্তির মন্ত্র।
যবে হয় ব্যর্থ
বলে, 'রণনীতি অব্যর্থ'।
সবুরে মেওয়া ফলে
আছি এ নয়া কৌশলে।'
হয়ে গেছো কি পাপেট ?
বলে 'তুমি নিন্দুক, গবেট।'

(৫)

হরেক মাল, হরেক মাল
কি নেবে বলো ভাই,
আছে এক আজব চিজ
দু' টাকাতে বিকাই।
জানতে চাও কিসে আজব ?
আজব সে এক জবর যাত্র
শোন তবে, বলছি এবে
ফুঁ দাও, উল্টাতে পারো গণতন্ত্র।
নিয়ে নাও, দেবো আরো সস্তা
ঠাণ্ডা করাও সব গণতন্ত্র,
শেয়াল মার্কা ট্রেড মার্ক
নাম তার সুরতনী 'বাদী' মন্ত্র।

(৬)

আমার নাম মিঃ চালবাজ
আয়রন ম্যান্ অব্ দা ইয়ার,
চালবাজি শেখাই তাদের
যারা আমার আদরের পিয়ার।
ফিস টিস চাইনা কিছু
চাই আমার তোষামোদ,
জনগণের অঢেল টাকায়
করতে পারো আমোদ-প্রমোদ।

কবিতা

ঘুঘু কব্যাল্যার সাধ

ঘুঘু কব্যাল্যা ডেকে কয় ওরে 'ভুদি'
আমার মগজে খেলেছে এক মহাবুদ্ধি।
সৃজিব এক স্বাধীন রাষ্ট্র, হবে নাম সুরতন,
বানাবো তোমারে মন্ত্রী, বন্ধু অতি পুরাতন।
দেশ স্বাধীন সোজা কথা নয়,
ল্যাংরা কাকিয়া চক্র আছে, নাহি রহে সংশয়।
দেবে তারা প্রাণ, হবে বলিদান সৃজিব 'সুরতন',
তুমি মন্ত্রী, আমি রাজা এই রবে অবদান।

জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ
মানবাধিকার কমিশন
বৈষম্য প্রতিরোধ ও সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা বিষয়ক সাব-কমিশন
আদিবাসী জনগণ বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাপান কমিটির বিবৃতি

জেনেভা
জুলাই ২৮, ১৯৯৪

ম্যাডাম চেয়ার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এই ওয়ার্কিং গ্রুপে আপনাকে চেয়ারপার্সন হিসেবে পুনঃনির্বাচিত করার জন্যও আমি অভিনন্দন জানাই। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাপান কমিটির প্রস্তুতকৃত সংক্ষিপ্ত বিবৃতি উপস্থাপনের দায়িত্ব দেয়াতে আমি তা পাঠ করছি। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি সম্পর্কে জাপানী নাগরিকদের মধ্যে ক্রমাগত উদ্বেগই প্রকাশ পায়।

জাপানের অনেক বেসরকারী সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গ যাঁরা ১৯৯২ সালে সংঘটিত লোগাং গণহত্যার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ কার্যক্রম সংগঠিত করেছিলেন তাঁদেরই অংশগ্রহণের আলোকে ১৯৯৩ সালের নভেম্বরে "পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাপান কমিটি" জন্মলাভ করে। এটি পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও ১৩০ টি বেসরকারী সংস্থাসমূহের সমন্বয়কারী একটি জাতীয় সংস্থা।

পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে সরাসরি তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে আমরা গত বছরের জুলাই

মাসে সেখানে আমাদের নিজস্ব পর্যবেক্ষক দল পাঠানোর চেষ্টা করেছিলাম। আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরের আবেদন তখন বাংলাদেশ সরকার [illegible] করেন। এ বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে [illegible] জুম্ম শরণার্থীদের প্রত্যাগমন পর্যবেক্ষণ করার জন্য আমাদের অনুমতি দিতে টোকিওস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসকে আমরা অনুরোধ করি। কিন্তু আমাদের এই অনুরোধ আবার প্রত্যাখান করা হয়। সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের বলা হয়েছিল যে, সেই এলাকায় প্রবেশের জন্য কোন মানবাধিকার সংস্থাকে অনুমতি দেয়া হয়নি এবং তারা আমাদের সংগঠনকে শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর নয় বাংলাদেশে প্রবেশের অনুমতি প্রদানের অনুরোধও প্রত্যাখান করে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাপান কমিটি অবশ্য গত নভেম্বর মাসে নানিয়াচর ঘটনার উপর চিঠি ও আবেদনপত্র প্রেরণের মাধ্যমে প্রচারাভিযান এবং বাংলাদেশ ও জাপানের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থাগুলোর সমর্থন আদায়ের প্রচেষ্টা চালিয়েছে। গত মার্চ মাসে যখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া জাপান সফরে আসেন তখন পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতিতে উদ্বেগ জানিয়ে অনেক বেসরকারী সংস্থার স্বাক্ষরিত আমাদের যুক্ত বিবৃতি জাপান সংসদের এক সদস্যের মাধ্যমে প্রদান করি।

এ'টি দুঃখজনক যে, যে সমস্ত দেশ গুরুতরভাবে মৌলিক মানবাধিকার লংঘন করছে সে সব দেশে জাপান সরকার এখনো প্রচুর পরিমাণে সরকারী উন্নয়ন সাহায্য দেয়া অব্যাহত রেখেছে। জাপান সরকার যদিও সময় সময় মানবাধিকার সম্পর্কে ভাসা ভাসা বুলি আউড়িয়ে থাকে তবুও পার্বত্য চট্টগ্রামে [illegible] নিপীড়ন করতে যে অর্থই প্রদত্ত উন্নয়ন সাহায্য ব্যবহৃত হচ্ছে সে ব্যাপারে চোখ বন্ধ করেই রয়েছে। জাপান বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দাতা এবং এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকেরও সবচেয়ে বড় যোগানদার, যেটি [illegible] জুম্ম জনগণকে বাঙ্গালী সমাজের মূল [illegible] নিম্ন সামাজিক স্তরে মিশে যেতে এবং জায়গা জমি থেকে উচ্ছেদ করতে ভূমিকা রাখে এমন সব অনেক অর্থায়িত উন্নয়ন প্রকল্প" পার্বত্য চট্টগ্রামে বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে সাহায্য করে আসছে।

আমরা বাংলাদেশকে দেয়া সকল উন্নয়ন সাহায্য বন্ধ করে দিতে জাপান সরকারকে বলছি না। যারা প্রকৃতই বৈষম্যের শিকার এবং যাদের সাহায্য প্রয়োজন তাদের জীবন উন্নততর করতে যাতে জাপানের সরকারী সাহায্য ব্যবহৃত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতেই অনুরোধ করছি। আরো বিশেষভাবে বলতে গেলে, ভারত থেকে জুম্ম শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন সহজতর করতে বাঙ্গালী বসতিস্থাপনকারীদের সমতলে পুনর্বাসনের জন্য জাপান সরকার যাতে তার সরকারী উন্নয়ন সাহায্য ব্যবহার করে আমরা এই অনুরোধ করছি। আমরা অবশ্য বিশ্বাস করি যে, শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনে তাদের নেতৃবৃন্দকে দেয়া প্রতিশ্রুতি বিশ্বস্ততার সাথে পালনে যদি বাংলাদেশ সরকার গভীর সদিচ্ছা দেখায় তবে জাপান সরকার বাংলাদেশকে দেয়া তার সরকারী উন্নয়ন সাহায্য বাড়াতে পারে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম শরণার্থীদের আবার ফেরত আনার লক্ষ্যে বাঙ্গালী বসতিস্থাপনকারী যারা জুম্ম জনগণের পৈতৃক ভিটেমাটি এখনো দখল করে আছে তাদের সমতলে ফেরত আসতে হবে। বাঙ্গালী বসতিস্থাপনকারীদের সমতল ভূমিতে পুনর্বাসনের জন্য প্রচুর পরিমাণ অর্থ সাহায্য প্রয়োজন। এ'টি অচিন্তনীয় যে, এই পুনর্বাসনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের যথেষ্ট অর্থ সম্পদ রয়েছে। তবুও বাংলাদেশ সরকার এখনো পর্যন্ত জুম্ম শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া কিংবা বাঙ্গালী বসতিস্থাপনকারীদের পুনর্বাসন প্রদানের বিদেশী সাহায্যের জন্য আবেদন করেনি। শরণার্থী নেতৃবৃন্দকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পালনে সরকারের আন্তরিকতা ও প্রকৃত সদিচ্ছার উপর এ'কারণেই আমাদের তীব্র সন্দেহ উদ্রেক করে।

বিভিন্ন সূত্র থেকে আমরা রিপোর্ট পেয়েছি যে, প্রত্যাগত শরণার্থীদের মধ্যে অনেকেই নিজ নিজ বাস্তুভিটা ও জায়গা জমি ফেরত পেতে সক্ষম হয়নি যেহেতু তাদের বাস্তুভিটা ও জায়গা জমি সেনাবাহিনী ও বাঙ্গালী বসতি স্থাপনকারীদের বেদখলে রয়ে গেছে। এদের মধ্যে খুব

কম সংখ্যক শরণার্থী তাদের পুনর্বাসনে সরকারের দেয়া প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সাহায্য পেয়েছে। আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয়টি শান্তিপূর্ণ এবং সুষ্ঠুভাবে সমাধান করা হবে। আমরা জুম্ম জনগণের ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি দিতে এবং সদিচ্ছা নিয়ে জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনা চালিয়ে যেতে বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ করছি। আমাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরের অনুমতি দিতেও বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ করছি। যতক্ষণ না পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামকে বেসামরিকীকরণ করা হচ্ছে এবং সকল জুম্ম শরণার্থী তাদের পৈতৃক জমিতে ফিরে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের প্রচারাভিযান অব্যাহত রাখবোই।

পরিশেষে জুম্ম জনগণের আবেদন শোনার ও জোরালোভাবে সমর্থন জ্ঞাপনের জন্য আমরা ওয়ার্কিং গ্রুপকে আবেদন জানাচ্ছি। বিশেষ করে শরণার্থী প্রত্যাবর্তন ও তাদের পুনর্বাসনে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি (ICRC) ও জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনারকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং সেখানে ও নাগিয়াচরে একজন পর্যবেক্ষক পাঠাতে সাব-কমিশনকে অনুরোধ করার জন্য আমরা আবেদন জানাই।

এছাড়া ম্যাডাম চেয়ার, আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি আদিবাসী জনগণ বিষয়ক জাতিসংঘের খসড়া ঘোষণাপত্র শুধুমাত্র একটি মৌখিক বিবৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে একটি কার্যকর ব্যবস্থার রূপলাভ করবে। আমাদের বিবৃতি প্রদানে সুযোগ দেয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

[জাপানের 'শিমিন গাইকো কেন্দ্র'-র উপদেষ্টা প্রফেসর তাকিমাসা তেশিমা কর্তৃক পঠিত। তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পাচজসস কর্তৃক মূল ইংরেজী ভাষা থেকে অনুবাদকৃত।]

মানবাধিকার কমিশন
আদিবাসী জনগণ বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ
১২ তম অধিবেশন
জেনেভা, ২৫-২৯ জুলাই, ১৯৯৪
এজেণ্ডা আইটেম-৫, "উন্নয়ন পর্য্যালোচনা"

পার্বত্য চট্টগ্রাম হিল উইমেনস ফেডারেশনের বিবৃতি

ম্যাডাম চেয়ার, আপনাকে ধন্যবাদ। আমার সংগঠন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম হিল উইমেনস ফেডারেশন' এবং বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণের পক্ষ থেকে আপনাকে এবং অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনি এবং আপনার সহকর্মীদের নির্বাচিত হওয়াতেও আমি অভিনন্দন জানাই।

জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবী তহবিলকে স্পনসরশীপের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যা না হলে এই সভায় অংশগ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না।

আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণের অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলার চেষ্টা করছি যারা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এখনো আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃত নয়। "বাংলাদেশে কোন আদিবাসী নেই। এখানে কিছু সংখ্যক লোক আছে যারা উপজাতি। সুতরাং বাংলাদেশে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত ১৯৯৩ সালকে বিশ্ব আদিবাসী বর্ষ হিসেবে উদ্‌যাপন করার কোন প্রয়োজন নেই।" বাংলাদেশ সরকারের এই বক্তব্য ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধিকে অস্বীকার করে।

এই শাসন বিধি পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনের মূল আইনগত দলিল হিসেবে এখনো বলবৎ আছে এবং জুম্মদের আদিবাসী হিসেবে স্বীকার করে। তাছাড়া আয়কর আইন ১৯২২, নং ৪ (৬) কাস ৫/৭৭/৫৮৯ যা "পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত আদিবাসী পাহাড়ী" দিয়ে শুরু করা হয়েছে সেই আইনসহ এটি অন্যান্য সরকারী প্রশাসনিক বিধি বিধান দ্বারা পুনঃ কার্যকর করা হয়েছে।

জুম্ম নারীরা জাতি এবং লিঙ্গ উভয়ের ভিত্তিতে বৈষম্যের সম্মুখীন হয়। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম হওয়াতে, সর্বোপরি এতদঞ্চলের বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ণ, শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের শিকার হয়। গ্রেফতার, আটক, মৃত্যু ইত্যাদি কারণে স্বামীর অনুপস্থিতিতে জুম্ম নারীরা বৃদ্ধ এবং শিশুসহ গোটা পরিবারের ভরণপোষণের ভার বহন করতে বাধ্য হয়। অথচ অনেকগুলি কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে খাদ্য ও উৎপাদন প্রক্রিয়া আজ বিপর্যয়ের সম্মুখীন—

১। ১৯৫৯-৬৩ সালে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ বাঁধ নির্মাণের ফলে এই অঞ্চলের ৪০ শতাংশ চাষযোগ্য ভূমি ডুবে যায়। ফলতঃ চাষযোগ্য জমির সংকটকে আরো তীব্রতর করে তোলে। এই বাঁধের ফলে হাজার হাজার জুম্ম জনগণ তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সমগ্র আয়তনের ১০ শতাংশ এলাকা প্লাবিত হয়।

২। বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় বনায়ন কার্যক্রমে জুম্ম জনগণের ভূমি ব্যবহারের ঐতিহ্যগত জুম চাষের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ।

৩। জনসংখ্যা স্থানান্তর কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক অ-আদিবাসী বসতি স্থাপনকারীদের অনুপ্রবেশ।

৪। সরকারের তীক্ষ্ণ নজরদারীতে জুম্মদেরকে গুচ্ছগ্রামে স্থানান্তরের কারণে কৃষিক্ষেত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এই স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় জুম্ম জনগণ বাড়ী ও কৃষিজমি হারায় এবং উৎখাত হয়।

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের শিবির থেকে জুম্ম শরণার্থীদের জোরপূর্বক প্রত্যাবাসনের জন্যেও আমরা উদ্বেগ প্রকাশ করছি। বাংলাদেশ সরকারের সুসংবদ্ধ অত্যাচারের কারণে ১৯৫৬ সাল থেকে ৫৬ হাজারেরও অধিক জুম্ম তাদের মাতৃভূমি ছেড়ে ত্রিপুরার শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ভারত এবং বাংলাদেশ সরকারের এক 'সমঝোতা স্মারকের আওতায় (মোট ১,৮৪৯ জন জুম্ম শরণার্থী ২'৩ শতাংশ) জুম্ম শরণার্থীর প্রথম দল গত ফেব্রুয়ারীতে স্বদেশ ফিরে আসে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই শরণার্থীদের অধিকাংশই তাদের জায়গায় পুনর্বাসিত হতে পারেনি। ইহাও জানা গেছে যে, সরকারী জনসংখ্যা কার্যক্রমের আওতায় বসতিপ্রাপ্ত অনুপ্রবেশকারী বাঙালীরা এখনো অধিকাংশ জুম্ম শরণার্থীদের ঘরবাড়ী ও জমিজমা বেদখল করে রয়েছে। আমি আরো উল্লেখ করতে চাই যে, শরণার্থীদের জমি ফেরতদান বিষয়টি প্রত্যাগমনের পূর্বশর্ত হিসেবে তাদের প্রদত্ত ১৩ দফা দাবীনামায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত ছিল। আমি আরো প্রত্যাবাসিত প্রথম শরণার্থী দলের বর্তমান অবস্থার আলোকে ১লা জুন, ১৯৯৪ এ প্রকাশিত "হিল ওয়াচ হিউম্যান রাইটস্ ফোরামে"র একটি রিপোর্ট ওয়ার্কিং গ্রুপে পেশ করতে চাই। আমি এটি আমার বিবৃতির সাথে সংযুক্ত করলাম। পার্বত্যাঞ্চলকে বেসামরিকীকরণের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অপর দাবীটিও পূরণ করা হয়নি। এই অবস্থায় অধিকাংশ শরণার্থীই স্বদেশে ফিরতে চাচ্ছে না এবং শরণার্থী শিবিরে অপর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদসহ দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রত্যাবাসনের দিন অর্থাৎ ২১শে জুলাই, ১৯৯৪, ভোর ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত অনশন ধর্মঘট করেছে। শরণার্থী শিবিরগুলোতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসায় মৌলিক সুবিধাগুলি পর্যাপ্ত নয়।

এই প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে হিল উইমেনস ফেডারেশনসহ জুম্ম জনগণ সংঘাত মুক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম পেতে চায়। তারা এমন জীবনযাপন করতে চায় যেখানে তাদের জীবনের এবং কাজের স্বাধীনতা থাকবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ বিশ্ববাসী এবং আদিবাসী ও

অ-আদিবাসী প্রতিনিধিদের কাছে নিম্নোক্ত দাবীর ভিত্তিতে জুম্ম জনগণের সংগ্রামকে সমর্থন করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে—

১। পার্বত্য চট্টগ্রামকে অচিরে বেসামরিকীকরণ করা।

২। জুম্মদের জায়গাজমি দখলকারী বাঙালী বসতি-স্থাপনকারীদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রত্যাহার করা।

৩। আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে যেমন, জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশন ও আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটির মাধ্যমে শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া পরিচালনা করা।

৪। বন ও পানি ব্যবস্থাপনাসহ জুম্মদের জীবনধারণোপ-যোগী এবং পরিবেশগতভাবে উপযোগী ঐতিহ্যগত কৃষি ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থাসমূহকে স্বীকৃতি দেয়া।

৫। নিজস্ব উন্নয়নের অগ্রাধিকার ক্ষেত্র নির্বাচনে জুম্মদের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

ধৈর্য্য প্রদর্শনের জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

[পার্বত্য চট্টগ্রাম হিল উইমেনস ফেডারেশন এর সভানেত্রী মিস্ কবিতা চাকমা কর্তৃক পঠিত। তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পাচজসস কর্তৃক মূল ইংরেজী ভাষ্য থেকে অনুবাদকৃত।]

বিপ্লবী তারুন্য ও মহান ত্যাগের প্রতীক—শহীদ দেবদাস

—শ্রী দেবাশীষ

শহীদ দেবদাসের আসল নাম মৃগাংক শেখর চাকমা। খাগড়াছড়ি জেলার অন্তর্গত কমলছড়ি গ্রামের নিবাসী শ্রী কালি কুমার চাকমার ছয় ছেলে মেয়ের মধ্যে সে ছিলো পঞ্চম সন্তান। গ্রামের পাঠশালায় তার বিদ্যাভ্যাস শুরু হয়। সে ১৯৭২ সনে খাগড়াছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস, এস, সি এবং রাংগামাটি সরকারী মহাবিদ্যালয় থেকে এইচ, এস পাশ করে। বাল্যকাল হতে সে ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী ও কর্মঠ ছিলো। গ্রামের যেকোন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান এবং গ্রাম উন্নয়নমূলক কাজে সে ছিলো সবচেয়ে উৎসাহী, প্রাণবন্ত ও অগ্রপথিক। গ্রামের যুবসমাজ তারই নেতৃত্বে এইসব কাজে সামিল হতো। তার এইসব গুণাবলী ও নৈতিক চরিত্রের মধ্যেই পরবর্তী কালে একজন সাচ্চা বিপ্লবী হয়ে উঠার বীজ লুক্কায়িত ছিলো। ছাত্রজীবনে পাহাড়ী ছাত্র সমিতির সক্রিয় সদস্য হিসাবে কাজ করার সময় শহীদ দেবদাস দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক অঙ্গন তথা বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের সংস্পর্শে এসে পড়ে। মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য মনে মনে প্রস্তুতি নেয় এবং সাথী বন্ধুদের অনুপ্রাণিত করে। তখন ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার বঙ্গবন্ধু শেখমুজিবর রহমানের শ্লোগানের প্রেরণায় মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে। খান সেনাদের অগ্রাভিযান ঠেকানোর জন্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ও শ্রেণী নির্বিশেষে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা পুলিশ, ই, পি, আর, ও ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলো। এসময় একদিন পড়ন্ত বেলায় খাগড়াছড়ি শহরের অনতিদূরে কমলছড়ি গ্রামের বৌদ্ধ বিহারের ঘাটে পৌছার পর পরই একটা স্পীড বোট খারাপ হয়। বোটের তিনজন আরোহীর মধ্যে একজন নিজেকে মেজর জিয়া (বি, এন, পি প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান) নামে পরিচয় দেন। ঐ সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে মুক্তিবাহিনীর শেষ

প্রতিরোধ মহালছড়ি ঘাঁটি মিজো ও পাকিস্তানী বাহিনীর যৌথ আক্রমণে পতন ঘটে। এই সংঘর্ষে ক্যাপ্টেন কাদের শহীদ হন এবং মেজর জিয়া ভারতের সীমান্ত অভিমুখে রওনা দেন। কমলছড়িতে স্পীড বোট খারাপ হলে তিনি পায়ে হেঁটে খাগড়াছড়িতে যাওয়ার মনস্থ করেন। খবর পেয়ে কমলছড়ি গ্রামবাসীরা সাহায্য করতে ঘাটে এসে জমায়েত হয়। তাদের মধ্যে অতি উৎসাহী যুবক দেবদাস ছিলো অন্যতম। গ্রামের কার্বারীর হেফাযতে স্পীড বোট রেখে মেজর জিয়া সঙ্গীদের নিয়ে খাগড়াছড়ির দিকে রওনা দেন। তাঁদের গাইড করে দেবদাসের নেতৃত্বে গ্রামের যুবকরা। শহীদ দেবদাস হাফ পেন্ট পরিহিত মেজর জিয়াকে কাঁধে করে কমলছড়ি ঘাট পাড় করে দেয় এবং অনেকদূর পথ এগিয়ে দিয়ে আসে। জিয়া তাদের ধন্যবাদ জানান এবং মুক্তি সংগ্রামে যোগ দিতে আহ্বান জানান। সেদিন তারা কতই না জল্পনা কল্পনা করে করে বাড়ি ফিরেছিলো। মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে তারা সকলে অস্থির হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু শেষ অবধি উগ্র বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার কুটিল চক্রে তাদের আর মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়ার সুযোগ হয়ে উঠেনি। ১৯৭১ সনে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। কিন্তু জুম্মদের ভাগ্য আকাশে স্বাধীনতার সূর্য্য উদিত হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে মুক্তিবাহিনী ঢুকার পর পরই পানছড়ি ও দিঘীনালায় নিরীহ জুম্মদের উপর হত্যাকাণ্ড চালানো হয়, ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়, পাকিস্তানী দালাল এই অজুহাতে জুম্মদের ধরপাকড়, জুম্ম নারীদের ধর্ষণ করা হয়। হত্যা নির্যাতন, ধর্ষন, অগ্নিসংযোগ ও লুঠপাট করে ব্যাক্তি বিশেষকে দমন করা গেলেও একটা জনগোষ্ঠীকে দমন করা যায় না। তাই সেদিন এই অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদে জুম্ম যুবসমাজ সোচ্চার হয়ে উঠে ও রুখে দাঁড়ায়। ঐক্যবদ্ধ হাজার হাজার জুম্ম কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের গিরি কন্দরে কন্দরে। আর প্রতিরোধের প্রস্তুতি গড়ে উঠতে আরম্ভ করে। দেবদাসও এই জাতীয় দুর্যোগময় দিনগুলিতে সাথী বন্ধুদের নিয়ে সংগঠনিক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পলাতক রাজাকার ও মুজাহিদদের কাছ থেকে অস্ত্রসংগ্রহের কাজে ক্লান্তিহীন ব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত রাখে। তারপর একদিন অধ্যয়নরত অবস্থায় সার্বক্ষনিক সক্রিয় সদস্য হিসাবে শান্তিবাহিনীতে যোগদান করে। সে শিশুসুলভ সরলতা, জনগণের সুখ দুঃখের প্রতি আন্তরিক সহমর্মিতা, জনগণের মধ্যেকার সমস্যা নিরসনে ন্যায় পরায়নতা ও গণতান্ত্রিক মনোভাব, গণসংগঠনের কাজের সহজ কর্মকৌশলের প্রয়োগ ক্ষমতা, বক্তব্য উপস্থাপনে সাধারণ মানুষের ভাষায় কথা বলার যোগ্যতা এবং নিরলস কর্মতৎপরতার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মনে অতি সহজেই একটা আসন করে নেয়। সর্বোপরি সে শান্তিবাহিনীর সিনিয়র ও জুনিয়র সদস্যদের কাছে সমান প্রিয়পাত্র ছিলো। বিপ্লবী জীবনে অসীম ত্যাগ স্বীকার, আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলনে কঠোর বাস্তবতাকে মেনে নেওয়া, ব্যাতিক্রমহীন নিয়মানুবর্তিতা, ব্যারাক লাইফ থেকে লড়াইয়ের ময়দান পর্যন্ত তার উপস্থিতি ও সুখ দুঃখের অংশীদারিত্ব, কঠোর পরিশ্রম করার সহনশীলতা, সাহস, সততা ও সত্যপরায়নতা—এইসব গুণাবলী দেবদাসের সাচ্চা বিপ্লবী চরিত্র গঠনে কঠিন শিলার রূপ দেয়। কাচালং জোনের কম্যাণ্ডারের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকাকালীন শহীদ দেবদাস ১৯শে মে, ১৯৭৭ সন গণসংগঠনের কাজ করতে গিয়ে নিরস্ত্র অবস্থায় বি. ডি. আর বাহিনীর পেট্রোল পার্টির হাতে বন্দী হয়। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী দেবদাস কতজন বি. ডি. আরকে ধরাশায়ী করে প্রথমে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও শেষ পর্যন্ত শত্রুর ব্যূহ ভেদ করে যেতে ব্যর্থ হয়। ঘটনাস্থলে তাকে বেধড়ক মারপিট করা হয় এবং বাঘাইছড়ি থানার মডেল টাউন হতে রিইনফোর্সমেন্ট গিয়ে তাকে ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারে নিয়ে আসা হয়। বন্দী অবস্থায় সেখানে দিনের পর দিন পর্যায়ক্রমে তাকে অত্যাচার ও নির্যাতন করে জবানবন্দী নেওয়া হয়। তার মুখে শুধু একটাই জবাব ছিল—"আমি শান্তিবাহিনীর সদস্য, আমার নাম দেবদাস, আমি মরে গেলেও কোন কথা বলবো না, তোমরা জুম্মদের ধ্বংস করছো বলে অস্ত্র ধরেছি" আশ্চর্য্য চারিত্রিক দৃঢ়তা তার। বিস্ময়কর তার নির্যাতন সহ্য করার ক্ষমতা। কি নিখাদ তার দেশ ও জাতিপ্রেম। কি নির্মল ভালবাসা তার সহযোদ্ধা ও জনগণের প্রতি।

নির্যাতন কেন, সে মৃত্যুকেও আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত ছিলো। তবুও কারোর নাম পর্যন্ত বলেনি, শান্তিবাহিনীর আস্তানার সন্ধান দেয়নি। এরপর মরিশ্যা (বাঘাইছড়ি) থেকে তাকে রাংগামাটির খানবাড়ির মৃত্যুগুহা নামক নরকে চালান দেওয়া হয়। সেখানে তাকে অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখী হতে হয়। নতুন করে তার উপর দিনরাত অমানুষিক নির্যাতন চলতে থাকে। কথা আদায় করার জন্য দফায় দফায় উত্তম মধ্যম চালানো হয়। মুখে কাপড় এঁটে পানি ঢেলে দিয়ে উদ্দেশ্য হাসিল না হলে মরিচের গুড়া পানিতে মিশিয়ে নাকে মুখে ঢেলে দেওয়া হয়। দিনের পর দিন খেতে না দিয়ে তার সামনে মৌ মৌ গন্ধযুক্ত সুস্বাদু খাবার রাখা হতো। তথ্য দিলে খেতে দেওয়া হবে। কিন্তু না, ঘৃনাভরে মুখ ফিরায়ে থাকে। হাজার ওয়াট' পাওয়ারের বাল্ব জেলে রেখে তাকে ঘুমাতে দেওয়া হতো না। কারেন্টের শক্ বার বার দেওয়া হতো। পানি খেতে চাইলে প্রস্রাব করে খেতে বলা হতো। প্রাকৃতিক কর্মাদি সারার জন্য সেলের ভেতরে একটা ভাঙ্গা টিন রেখে দেওয়া হতো। ফলে, ছিদ্র ও ফাটল দিয়ে মল মেশানো প্রস্রাব চুইয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়তো। এই নোংরা মেঝে ছিলো দেবদাসের বিছানা। এতো কিছু করেও তার কাছ থেকে কোন কথা আদায় করা যায়নি। প্রথমে খানবাড়ির যমরাজ (কম্যাণ্ডিং অফিসার) তার অনুচরদের কথায় বিশ্বাস করতে পারেনি, যে দেবদাসের মুখ থেকে তারা একটা কথাও বের করতে পারেনি। যমরাজের নির্যাতনের কৌশল নিয়ে অহংকার ছিলো, গর্ব করে বলতো, "আইজ্জ পর্যন্ত কোন বন্দী খান বাড়িত্ আইয়্যানে মুখ বন্ধ গরি থাকিত ন'পারে, এক সময় নয় এক সময় কথা অগলন্ পোরগ্যা।" অনুচরদের ও অন্যান্য বন্দীদের তটস্থ করে হুংকার দিয়ে বলে, আঁই সাই উমুত্তুম খাপ্পুয়ার পুয়া দেবদাস কেঁতে মুখ ন'খুলে কেঁতে কথা ন'কস্।" নিজের চোখের সামনেই নির্যাতনের হুকুম চালাতো। কোন কথা মুখ থেকে বের করতে পারছে না দেখে নিজেই পেটাতে শুরু করতো এবং বলতো "ওবা ক'সাই, আঁর নাম দেবদাস, আঁইয়্ বাচালং জোনের কম্যাণ্ডার, এ'বার ক" আঁবার বারাক......উমুক জাগাত্, আঁবার ক্যাসে হাউস...... উমুক জাগাত্ ইত্যাদি।" সবই বৃথা প্রথম দু'টো বাক্য ছাড়া দেবদাসের কাছ থেকে একটা শব্দও বর করানো যায়নি। যন্ত্রনার ভার বইতে ব্যর্থ হলে দেবদাস জ্ঞান হারিয়ে ফেলতো এবং জ্ঞান ফিরে আসা পর্যন্ত কিছুক্ষণ নিস্কৃতি পেতো। নির্যাতনের উপর বহু ডিগ্রি প্রাপ্ত এফ আই ইউ-এর বাঘা অফিসার ব্যর্থ হয়ে রাগে গজরাতে গজরাতে চলে যাওয়ার সময় বলতো, "শালা ম"রবো ত' এক্কান কত্তাঅ' ন"কইবো, ক্যান মানুষ ?" সত্যি কথা বলতে কি— এইভাবে লৌহ কঠিন বিপ্লবী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী দেবদাসের কাছে বাংলাদেশ সেনা-বাছাই করা নির্যাতনকারী অফিসারেরা একে একে হার মেনে নেয়। কিন্তু আক্রোশ ও জিগাংসা বিন্দুমাত্র না কমে বরং বেড়ে যায়। মনস্তত্ত্ব বলে কোন ব্যক্তি তার শত্রুকে অত্যাচার নির্যাতন করেও যখন জয় করা যায় না, তখন তাকে প্রাণে বিনাশ করার দিকে তার মন ধাবিত হয়।" দেবদাসের বেলায়ও তাই হয়। তাকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত শত্রু অফিসাররা নেয়। তাও একটু নাটকীয়ভাবে।

রাঙ্গামাটির খাঁনবাড়ি হতে দেবদাসকে খাগড়াছড়ি ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে চালান দেওয়া হয়। তার মা-বাবাকে ছেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য দেওয়া হয়। এটা মানবতা প্রদর্শন নয়, তার মা-বাবাকে দেখায়ে মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া এবং কথা আদায় করা। শান্তিবাহিনী সদস্যদের মা-বাবাদের উপর মানসিক-শারীরিক নির্যাতন করা হয় বলে তার মা ও বাবা ভয়ে দেখা করেনি। মা-বাবা হয়েও নিষ্ঠুর নিয়তিকে মেনে নিতে হয়েছিলো— ছেলের শেষ মুখ দর্শন আর হয়ে উঠেনি। শত্রুর অপকৌশলও আর কাজে আসেনি। তারপর ১৯৭৭ সালে খাগড়াছড়ি ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার থেকে একদল আর্মী দেবদাসকে হাঁটিয়ে কমলছড়ি ফেরীঘাটে নিয়ে আসে। সেসময় দেবদাস প্রায় পঙ্গু, হাঁটতে পারছিলো না। দুইজন আর্মীর কাঁধে ভর দিয়ে কোন রকমে পা গুলো টেনে হেছড়ে চলছিলো। ঘাটে পৌঁছে তাকে দাঁড় করায়ে দেওয়া হয় এবং প্রকাশ্য দিবালোকে চেঙ্গী নদীর দু'পারের শত শত মানুষের সামনে তার বুক লক্ষ্য করে ব্রাশ ফাইয়ার করা হয়। দেবদাসের প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যায়। আর্মীরা

দেখাযে মৃতদেহ ফেলে চলে যায়। দাহ করার সময় দেখা যায় তার হাত ও পায়ের সব আঙ্গুল সেঁচে দেওয়া হয়েছে এবং চৌদ্দটা উত্তপ্ত বুলেট বুক ঝাঁঝিড়া করে বের হয়ে গেছে। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, যেই কমলছড়ি ফেরী ঘাট নিজের কাঁধে করে মুক্তিযোদ্ধা মেজর জিয়াকে দেবদাস পাড় করে দিয়ে বিপ্লবী হবার প্রেরণা পেয়েছিলো, আট বছর পর সেই কমলছড়ি ফেরী ঘাটেই সেই মেজর জিয়া (পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান)-এর সেনাবাহিনীর হাতে তাকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকামী মুক্তিযোদ্ধা হবার অপরাধে প্রাণ বিসর্জন দিতে হলো। এইভাবে একজন সাচ্চা বিপ্লবীর জীবন অবসান হয়। শত্রুকে সামান্যতম তথ্য না দিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের ক্ষতি না করে দেবদাস মৃত্যুকে জয় করেছিলো, উগ্রজাতীয়তাবাদী, সাম্প্রদায়িক ও সম্প্রসারণবাদী শত্রুর উপর শহীদ দেবদাস তাঁর নিজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ করেছিলেন। শহীদ দেবদাস মরেও মৃত নয়—সে মৃত্যুঞ্জয়ী। হে মৃত্যুঞ্জয়ী মহান বীর তুমি শুধু ছয় লক্ষাধিক জুম্ম জনগণের মনোমন্দিরে নয়, যুগে যুগে দেশে দেশে বিপ্লবী কর্মী ও সংগ্রামী জনগণের কাছে অমর হয়ে থাকবে; নির্যাতিত, নিপীড়িত জাতি ও মেহনতি মানুষের কাছে চিরদিন বিপ্লবের প্রতীক হিসেবে বেঁচে থাকবে। শুধু তাই নয়—যুব সমাজের কাছেও চিরদিন তুমি বিপ্লবী তারুণ্যের ও সংগ্রামী প্রেরণার এক উৎসস্থল হয়ে থাকবে। হে মহান জুম্মবীর, লহো আমাদের শুদ্ধাঞ্জলী। লহো হাজার লাল সালাম।

সংবাদ

জেনেভা সম্মেলনে জুম্ম সমস্যা

বিগত জুলাইয়ে জেনেভাতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের মানবাধিকার সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম সমস্যাটি গুরুত্ব সহকারে উত্থাপিত হয়েছে।

এ সম্মেলনে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে জুম্ম শরণার্থী প্রত্যাবাসনের বিষয়টি উত্থাপন করেন IWGIA এর প্রতিনিধি মিঃ মাইক ফোসটার। তিনি বলেন, জুম্ম শরণার্থীদের বাস্তভিটা ও জমি এখনও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বসতিকারীদের দখলে রয়েছে। তাই জুম্ম শরণার্থীরা প্রত্যাবর্তনে অনিচ্ছুক। তিনি আরো বলেন, '৯২ সনে লোগাং হত্যাকাণ্ডের পর ৩,৫০০ জুম্ম শরণার্থী ত্রিপুরার আশ্রম নিলেও তাদেরকে রেজিস্ট্রিভুক্ত করা হয়নি। তাই তারা ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। তিনি জুম্ম শরণার্থীদের তত্ত্বাবধান করতে জাতিসংঘের শরণার্থী কমিশনকে (UNHCR) প্রবেশের অনুমতি প্রদানের দাবী উভয় সরকারের নিকট উত্থাপনের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

এই সম্মেলনে জুম্ম সম্প্রদায়ের সমস্যাটি উত্থাপন করেন মিঃ রোল্যাণ্ড বস (Roeland Bos)। এ ছাড়া এ সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে বিবৃতি প্রদান করেন জনসংহতি সমিতির ইউরোপীয় প্রতিনিধি ডঃ প্রাবেন্দু শেখর দেওয়ান, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রী সঞ্চয় চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভানেত্রী মিস কবিতা চাকমা।

প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের পুনর্বাসন সম্পর্কে মানবাধিকার সংগঠনগুলির রিপোর্ট

বাংলাদেশের মানবাধিকার সংস্থাগুলি প্রত্যাবাসিত জুম্ম শরণার্থীদের পুনর্বাসনের অব্যবস্থার এক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার ৫ জন মানবাধিকার কর্মী সরেজমিনে পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করে বিগত মে মাসে এই রিপোর্টটি প্রকাশ করেন।

উক্ত রিপোর্টে দেখা যায় যে, তাদের প্রদর্শিত ৪২টি পরিবারের মধ্যে খাগড়াছড়ি সদরে প্রত্যাবাসিতরা নিজেদের বাস্তভিটায় যেতে পারলেও পানছড়ি ও দিঘীনালা থানার প্রত্যাবাসিতদের অনেকেই বাস্তভিটা ও আবাদী জমি ফেরত পায়নি। আর সরকারের প্রতিশ্রুত হালের বলদ, সরকারী চাকুরীতে পুনর্বহাল ও পর্যাপ্ত রেশন না পেয়ে অনেকে হতাশ হয়ে অনিশ্চিত জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা করা হয় যে, ৫ই মে তারিখে অনুষ্ঠিত জনসংহতি সমিতি ও সরকারী কমিটির ৭ম বৈঠকটি অস্ত্র বিরতির মেয়াদ বৃদ্ধি ভিন্ন লক্ষ্যণীয় কোন অগ্রগতি ছাড়া শেষ হলে প্রত্যাগতদের মধ্যে হতাশা বৃদ্ধি পায়। এতে যুদ্ধ বিরতির মেয়াদ শেষ হলে সেনাবাহিনীর ব্যাপক ধরপাকড়, নির্যাতন ও বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা হতে পারে বলে অনেকেই আশংকা করছেন।

তদন্ত রিপোর্টে বলা হয় যে, প্রত্যাগতদের ৪২টি পরিবারের মধ্যে ৩৭% ভাগ নিজেদের বাস্তভিটা ফেরত পায়নি। ১৯৮৬ সালে দেশ ত্যাগের পর তাদের বাস্তভিটা সংলগ্ন যে সব এলাকায় সেনা ক্যাম্প ও বসতিকারীদের বসতি গড়ে উঠেছিল সেগুলো সরে না যাওয়াতে প্রত্যাগতরা নিজেদের বাস্তভিটায় যেতে পারেনি। এছাড়া সফরকারী মানবাধিকার কর্মীরা সফরের সময় প্রত্যাগত শরণার্থী, স্থানীয় লোকজন ও সরকারী কর্মকর্তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেন। এসব আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে, বিভিন্ন অঞ্চলে পুনর্বাসিত অউপজাতিদের ভূমি বেদখলের ফলে প্রত্যাগতদের পুনর্বাসন ব্যাহত হচ্ছে। তাছাড়া জনসংহতি সমিতি ও সরকারের মধ্যে আলোচনা চলা সত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল সমস্যার কোন অগ্রগতি হচ্ছে না। এতে জুম্মদের হতাশা ও অনিশ্চয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদের আহ্বানে ৫ সদস্যের এই তদন্ত দলটি ৫—৮ মে খাগড়াছড়ি, পানছড়ি ও

দিঘীনালা থানা এলাকায় সফর করেন। এই তদন্ত দলটি সদর থানায় ৮টি, পানছড়ির ২১টি ও দিঘীনালায় ১৬টি মোট ৪২টি পরিবারের খোঁজ-খবর নেন। এই তদন্ত দলের সদস্যরা হলেন—একরাম হোসেন, বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ, ইদ্রিস্থর রহমান, পার্বত্য চট্টগ্রাম মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ জাতীয় কমিটি, সালমা আলী, জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতি; ইউ এম হাবিবুন্নেসা, আইন ও সালিস কেন্দ্র ও কামরুল হাসান, মানবাধিকার সাংবাদিক ফোরাম।

জুম্ম শরণার্থী প্রতিনিধিদের পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরের রিপোর্ট (২য়) প্রকাশিত

জুম্ম শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের প্রথম ব্যাচে প্রত্যাগত শরণার্থীদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সরেজমিনে তদন্ত করে শরণার্থী নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরের দ্বিতীয় রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। গত ১৩ই মে প্রকাশিত ৭৪ পৃষ্ঠায় এই রিপোর্টে আবার ব্যাপক ভূমি বেদখল, ধর্মীয় পরিহানি, ধর্ষণ ও নির্যাতনের অভিযোগ আনা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের ১৬ দফা সম্বলিত একগুচ্ছ প্রস্তাবের ভিত্তিতে গত ১৫-২২শে ফেব্রুয়ারী ৩৭৯টি পরিবারের ১৮৪৬ জন জুম্ম শরণার্থী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই প্রত্যাগত শরণার্থীদের দেয়া প্রতিশ্রুত সুযোগ সুবিধাদি পূরণ করা হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য গত ২৫-২৯ এপ্রিলে ৬জন ভারতীয় অফিসার ও ১৮ সদস্যের এক শরণার্থী প্রতিনিধি দল পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করেন। এই সফরকারী দলটি ঐ সময়ে রামগড়, পানছড়ি, দিঘীনালা ও লংগদু থানা পরিদর্শন করেন। এ পরিদর্শনের সময়ে প্রতিনিধিরা প্রত্যাগত শরণার্থী ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন এবং প্রদর্শিত এলাকার ভূমি বেদখল, ধর্মীয় পরিহানি, ধর্ষণ ও অত্যাচারেরর সংবাদ প্রাপ্ত হন। এই রিপোর্টে ৬০১টি ভূমি ও বাস্তভিটা বেদখল, ৪টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস, অনেক নির্যাতনের তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

এ তদন্ত দলটি পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক অবস্থা পর্য্যালোচনার পর নিম্নোক্ত মতামত পেশ করে।

১) কতিপয় শরণার্থী ছাড়া অধিকাংশ প্রত্যাগত শরণার্থীরা তাদের বেদখলকৃত জমি ও বাস্তভিটা ফেরত পাননি। আর ১৬ দফার মধ্যে ১০ হাজার টাকা, ২ বাণ্ডেল সি আই টিন ছাড়া বাকী সুযোগ-সুবিধাদি এখনও পূরণ করা হয়নি।

২) জনসংহতি সমিতি ও সরকারের যুদ্ধবিরতির ফলে বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থা স্বাভাবিক থাকলেও যে কোন সময়ে পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এমতাবস্থায়ও জুম্ম জনগণ সেনাবাহিনীর নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

৩) ভারতের ত্রিপুরায় আশ্রিত ৫৪ হাজার শরণার্থী ছাড়াও বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের ফলে ভিটেমাটি ছাড়া কয়েক হাজার জুম্ম এখনও নিজ বাস্তভিটায় আসতে পারেনি যা অস্বাভাবিক অবস্থার পরিচায়ক।

৪) জুম্ম শরণার্থীদের পেশকৃত ১৩ দফায় অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক বিষয়গুলো সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যেকার সংলাপেও কোন অগ্রগতি হচ্ছে না। এই রাজনৈতিক বিষয়গুলির সমাধান ব্যতীত অর্থনৈতিক বিষয়গুলো মূল্যহীন বিধায় জুম্ম শরণার্থীদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন ও সম্মানজনক প্রত্যাগমন সম্ভব নহে।

রিপোর্টে আরো দাবী জানানো হয় যে—

(১) প্রদত্ত ১৬ দফা গুচ্ছ প্রস্তাবের বাস্তবায়নে ও শরণার্থীদের নিরাপত্তা এবং সুষ্ঠু পুনর্বাসনের জন্য জনসংহতি সমিতির সাথে ফলপ্রসূ সমাধানে আসতে হবে।

২) জুম্ম শরণার্থীদের পুনর্বাসনের সাথে স্বদেশে উদ্বাস্তু পরিবারগুলিরও পুনর্বাসন করতে হবে।

৩) জুম্ম শরণার্থীদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের জন্য UNHCR ও ICRC কে প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়ায় জড়িত করতে হবে।

প্রত্যাবাসিত জুম্ম শরণার্থীদের সাংবাদিক সম্মেলন

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে প্রত্যাবাসিত জুম্ম শরণার্থী নেতৃবৃন্দ গত সেপ্টেম্বরে চট্টগ্রামে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছে। এ সম্মেলনে শরণার্থী

নেতৃবৃন্দ তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন ও ১৬ দফা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের কাছে জোর দাবী জানিয়েছে।

গত ৫ই সেপ্টেম্বরে আয়োজিত এই সম্মেলনে শরণার্থী নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করে বলেন যে, প্রত্যাবাসনের শর্তানুযায়ী প্রত্যাবাসিত অনেক চাকুরীজীবি শরণার্থীকে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়নি এবং যাদেরকে নিয়োগ করা হয়েছে তাদেরকেও জ্যেষ্ঠতা ও বাৎসরিক বৃদ্ধি ভাতা দেয়া হচ্ছে না। এ ছাড়া বয়স উত্তীর্ণ ও বেকার যুবকদেরও কোন কর্মসংস্থান হচ্ছে না।

শরণার্থী নেতৃবৃন্দ আরো অভিযোগ করেন যে, তাদেরকে কেবলমাত্র মাসে ৮৪ কেজি চাল দেয়ার বড় পরিবারগুলো খুবই অসুবিধায় পড়েছে। শিশু খাদ্য না দেয়ায় শিশুরা পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। এছাড়া শর্তানুযায়ী কৃষকদেরকে হালের বলদ ও ২০০ ঘনফুটের কাঠের পারমিটও দেয়া হচ্ছে না।

শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সবচেয়ে বড় অভিযোগটি ছিল ভূমি সংক্রান্ত। তারা বলেন—তাদেরকে নিজের জমিতে পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আনা হলেও এখনও পর্যন্ত অনেক শরণার্থী নিজের বাস্তুভিটা ও জায়গা জমি ফেরত পায়নি। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে তারা পানছড়ি থানায় পায়ং কার্বারী পাড়ায় ২০ পরিবার ও কালানাল এলাকায় ৩১ পরিবার ও অনেকের কথা উল্লেখ করেন। তারা অভিযোগ করে বলেন, এদের জায়গা জমি এখনো অনুপ্রবেশকারীদের বেদখলে রয়েছে।

পরিশেষে শরণার্থী নেতৃবৃন্দ ১২টি দাবী উত্থাপন করেন। দাবীগুলো হলো—প্রতিশ্রুত ১৬ দফার বাস্তবায়ন, চাকুরীজীবিদের সকল সুবিধাসহ পুনঃনিয়োগ, হালের বলদ প্রদান, ভূমিহীনদের ৫ একর জমি প্রদান, প্রতিশ্রুত আনুষঙ্গিক ৫ হাজার টাকা প্রদান, বাস্তুভিটা ও জমি ফেরত প্রদান, বেকারদের চাকুরী প্রদান, প্রতি পরিবারকে ২০০ ঘনফুট কাঠের পারমিট প্রদান, প্রত্যাবাসিতদের বিষয়-সম্পত্তি ও জীবনের নিরাপত্তা প্রদান, অতিরিক্ত ৬ মাসের রেশন প্রদান ও শরণার্থী পুনর্বাসন কমিটিতে শরণার্থীদের মনোনীত ৩ জন প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করা।

সাংবাদিক সম্মেলনে পঠিত বিবৃতিতে স্বাক্ষর প্রদান করেন সর্বশ্রী সমীরকান্তি দেওয়ান, সন্তু বিকাশ দেওয়ান, সুকীর্তি জীবন চাকমা, আনন্দমোহন চাকমা, সমরেন্দ্র লাল চাকমা, বনলক্ষ্মী চাকমা, অটুট রঞ্জন চাকমা ও কমল জ্যোতি চাকমা।

জুম্ম নারী ধর্ষণ

বাংলাদেশ সেনা কর্তৃক এক জুম্ম নারী ধর্ষণের ঘটনা ফাঁস করলে গুলি করে হত্যা করার হুমকি দেয়ার এক চাঞ্চল্যকর খবর পাওয়া গেছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, গত ১১ই জুলাই তারিখে রাঙ্গামাটি সদরের অন্তর্গত ৫৯নং বন্দুকভাঙ্গা মৌজার খারিক্ষং গ্রামের ছায়ারানী চাকমাকে (৩০) স্থানীয় খারিক্ষং ক্যাম্পের জনৈক মজিদ ধর্ষণ করে। ঐদিন দুপুরে ছায়ারানী নিকটবর্তী জঙ্গলে লাকড়ী আনতে গিয়ে এ ধর্ষণের শিকার হয়। ধর্ষণের পর মজিদ তার কাছ থেকে একটা দা ও একজোড়া কানের দুল ছিনিয়ে নেয়। এরপর বন্দুকভাঙ্গা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের মেম্বার চন্দ্র কিশোর চাকমা ও গ্রামের মুরুব্বীরা এ ধর্ষণের বিচার চেয়ে ক্যাম্প কম্যাণ্ডারের কাছে অভিযোগ উত্থাপন করেন। ক্যাম্প কম্যাণ্ডার হাবিলদার মোঃ আবছার এর জন্য প্রথমে ৩০০ টাকা, তারপর ৫০০ টাকা ও শেষে ১২০০ টাকা দিয়ে সমস্যাটি মীমাংসা করার চেষ্টা করে। কিন্তু স্থানীয় মুরুব্বীরা এতে রাজী না হলে ক্যাম্প কম্যাণ্ডার শেষ পর্যন্ত টাকাগুলো নিতে বাধ্য করে ও ঘটনাটি প্রকাশ করলে গুলি করে হত্যা করার হুমকি দিয়ে সকলকে বিদায় করে।

সশস্ত্র বাহিনীর মানবাধিকার লংঘন

অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ সেনা সদস্যরা তাদেরই রসদ বহনকারী কুলী জনৈক জ্ঞান আলো চাকমাকে গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

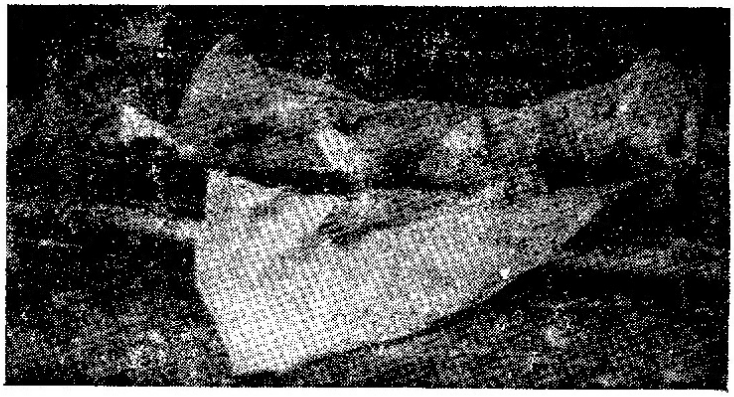

[জ্ঞান আলো চাকমার মৃতদেহ]

প্রাপ্ত খবরে জানা যায় যে বিগত আগষ্ট মাসে বাংলাদেশ সেনারা যুদ্ধবিরতি লংঘন করে কাচালং রিজার্ভ ফরেষ্টে লাক্সছড়িতে এক নূতন ক্যাম্প স্থাপন করে। এই ক্যাম্পের সেনারা গত ১৭ই আগষ্ট উক্ত জ্ঞান আলোকে গো-মাংস বহনের কুলী হিসেবে ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে গভীর বনাঞ্চলে তার বুক ও ডান পায়ে গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করে। আরো জানা যায় যে, উক্ত নিহত জুম্ম বাঘাই ছড়ি থানার বঙ্গলতুলী গ্রাম (রাঙ্গামাটি) নিবাসী হলেও তার মরদেহ রহস্যজনকভাবে খাগড়াছড়িতে পাঠানো হয়। পরিশেষে নামমাত্র ময়নাতদন্তের পর কিছু টাকাসহ তার বিকৃত লাশ আত্মীয় স্বজনের নিকট হস্তান্তর করে। উল্লেখ্য যে, এই হত্যাকাণ্ডের জন্য থানায় কোন এজাহার দেয়া হয়নি ও ময়নাতদন্তের রিপোর্টও পাওয়া যায়নি। এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের দায় থেকে বাঁচার জন্য শান্তিবাহিনী কর্তৃক গুলিকরা হয়েছে এই মর্মে সরকার পত্রপত্রিকায় অপপ্রচার করে থাকে।

মানবাধিকার কর্মীদের অগণতন্ত্রের পাঁয়তারা

সম্প্রতি এক সাম্প্রদায়িক সংগঠন কর্তৃক তিনজন মানবাধিকার কর্মীকে গ্রেপ্তার করার দাবী জানানো হয়েছে। এমনকি উক্ত সংগঠনটি একই দাবীতে হরতাল পালনের হুমকিও প্রদান করেছে।

গত ২৩শে আগষ্ট প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিতে খাগড়াছড়ি ভিত্তিক বাঙ্গালী কৃষক শ্রমিক কল্যাণ পরিষদ দেশের প্রখ্যাত মানবাধিকার কর্মী ফাদার টিম, আকরাম হোসেন চৌধুরী ও রোজালিন কোস্তাকে গ্রেপ্তার করার দাবী জানিয়েছে। এ বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত তিনজন মানবাধিকার কর্মীকে ভিত্তিহীনভাবে দেশদ্রোহী কাজে লিপ্ত রয়েছে বলে অভিযোগ ও তাদেরকে গ্রেপ্তার করা না হলে ২২শে সেপ্টেম্বর থেকে হরতাল পালনের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। রেজাউল করিম হেলাল স্বাক্ষরিত এ বিজ্ঞপ্তিতে কোন প্রমাণ ছাড়া আরো অভিযোগ করা হয় যে, উক্ত মানবাধিকার কর্মীরা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে ভুয়া কাল্পনিক তথ্য বিদেশে পাচার ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদকে অর্থ যোগান দিয়ে আসছে। বলা বাহুল্য যে, এ ভিত্তিহীন অভিযোগ ও ঘোষণার ফলে বাঙ্গালী কৃষক শ্রমিক পরিষদ এর চরম সাম্প্রদায়িকতা ও অগণতান্ত্রিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

সেনা কম্যাণ্ডারের দার্শনিক মন্তব্য

গত ১০ই আগষ্ট নানিয়ারচর জোন সদরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় রাঙ্গামাটি ব্রিগেড কম্যাণ্ডার পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা ও পরিস্থিতির উপর বিভিন্ন মন্তব্য প্রকাশ করেন। তার এই সকল মন্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সম্পর্কে সেনাবাহিনীর মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে।

ঐদিন সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে নানিয়ারচর থানাধীন সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার, মৌজার হেডম্যান, কার্বারী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও চাকুরীজীবি-দের এক সভা আহ্বান করা হয়। উক্ত সভায় রাঙ্গামাটি ব্রিগেড কম্যাণ্ডার কর্ণেল এনায়েত হোসেন প্রধান বক্তব্য রাখেন। তাঁর এই বক্তব্যের সময় তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা পরিস্থিতির সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য ও যুক্তি উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন— পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর উপস্থিতির কারণ হচ্ছে শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসী তৎপরতা। তিনি মুসলমান বাঙ্গালীদের পুনর্বাসন সম্পর্কে বলেন— যেহেতু শান্তি-বাহিনী চোরাগুপ্তা হামলা চালায়, তাই সেনাবাহিনীর নিরাপত্তা ও তথা আত্মরক্ষার জন্য সম্ভাব্য স্থানে বাঙ্গালী পুনর্বাসন করা হয়। তিনি যুক্তি সহকারে বলেন—মানুষ সামাজিক জীব এবং পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। আমরা যেখানে ক্যাম্প স্থাপন করি সেখানে আপনারা বাস করেন না। সেই কারণে বাঙ্গালী এনে বসতি স্থাপন করাতে হয়।

তিনি আরো বলেন, জনসংহতি সমিতির অন্যতম দাবী হলো সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা। সরকার নির্দেশ দিলে যে কোন মুহূর্তে আমরা চলে যেতে বাধ্য; যেহেতু আমরা হলাম চাকুরীজীবী; আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চাই। কেবলমাত্র শান্তিবাহিনীরা ও আপনারা শান্তি চান না। তাই আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের সামরিক শাসন চলছে। তিনি আরো বলেন—বে-সামরিক প্রশাসন ও ঠিকেদার দ্বারা উন্নয়নমূলক কাজ ঠিকভাবে হয় না। তাই এখানে সামরিক প্রশাসন। তিনি আরো জানান যে, সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে আরো দুই কোম্পানী সেনা নিয়োগ করা হয়েছে।

উক্ত সভায় এসব মন্তব্য করার পর কাউকে বক্তব্য প্রদান করতে দেয়া হয়নি। সভায় প্রায় দুইশত শিক্ষিত জুম্ম উপস্থিত ছিলেন। বস্তুতঃ জুম্ম জনগণকে ভয় প্রদর্শন স্বরূপ উক্ত সভাটি আহ্বান করা হয়।

সেনাবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত

সম্প্রতি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও শান্তিবাহিনীর মধ্যে এক সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যেকার চলমান যুদ্ধবিরতি লংঘন করে বাংলাদেশ সেনারা কম্বিং অপারেশন চালালে এই সংঘর্ষ ঘটে। এই সংঘর্ষে ৪ জন সেনা নিহত ও দু'জন আহত হয়েছে।

প্রাপ্ত খবরে জানা যায় যে, ২৩শে আগষ্ট নানিয়াচর জোন (৪০ বেঙ্গল) নিয়ন্ত্রিত বেতছড়ি ক্যাম্প, কেঙেলছড়ি ক্যাম্প ও ঘাগড়া জোন (১৮ বেঙ্গল) নিয়ন্ত্রিত কুতুকছড়ি ক্যাম্প হতে তিন শতাধিক সেনা কম্বিং অপারেশন চালানোর উদ্দেশ্যে নানিয়াচর থানা হতে ১০ কিঃ মিঃ প্রত্যন্ত অঞ্চল দাজ্যাপাড়া, তিবিরাছড়ি, লার্মাপাড়া এবং ৭৯ নং কেঙেলছড়ি মৌজাতে জড়ো হয়। পরদিন সেনারা আরো প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রবেশ করলে সকাল ১১টায় শান্তি-বাহিনীর সদস্যরা এক প্রতিরোধাত্মক আক্রমণ চালায়। একইভাবে ২৮শে আগষ্ট বিকাল ৩টায় শান্তিবাহিনীর সদস্যরা আরো এক প্রতিরোধমূলক আক্রমণ চালাতে বাধ্য হয়। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে, এই দু' দফার আক্রমণে ৪ জন সেনা নিহত ও ২ জন আহত হয়।

এই প্রতিরোধ আক্রমণের মুখে বাংলাদেশ সেনারা পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং তিবিরাছড়ি, দাজ্যাপাড়া, বেতছড়ি ও জুর্ব মহাজন পাড়ার কয়েকজন গ্রামবাসীকে আটক ও মারধর করে। এসময়ে সেনারা বিনামূল্যে গ্রামবাসীদের পালিত মোরগ ও ছাগল আত্মসাৎ করেছে বলে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য যে, এ ঘটনাকে শান্তিবাহিনীর যুদ্ধবিরতি লংঘন হিসেবে দেশের পত্র পত্রিকায় প্রচার ও মাত্র দু'জন সেনার আহত হওয়ার কথা স্বীকার করা হয়েছে।

সেনা ক্যাম্প স্থাপন

জনসংহতি সমিতি ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যেকার বিরাজমান যুদ্ধবিরতি লংঘন করে বাংলাদেশ সেনা-বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নূতন সেনাক্যাম্প

স্থাপন করে চলেছে। অতি সম্প্রতি স্থাপিত ক্যাম্পগুলো হচ্ছে—

(১) জাহাঙ্গীর টিলা ক্যাম্প, হাতি মুড়ানি, মৈদুং মৌজা, জুরাছড়ি থানা, রাঙ্গামাটি জেলা।

(২) ঢেবাছড়ি, বি ডি আর ক্যাম্প ঢেবাছড়ি, ১০৬নং কামিলাছড়ি মৌজা, কাপ্তাই থানা, রাঙ্গামাটি জেলা।

(৩) লাঙ্গলমারা, বাঘেরহাট, বাঘাইছড়ি থানা, রাঙ্গামাটি জেলা।

(৪) নামছড়ি ক্যাম্প, বাঘাইছড়ি থানা, রাঙ্গামাটি জেলা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাপান কমিটি'র কর্মসূচী জাপানে দেশব্যাপী প্রচারাভিযান শুরু "আমরা প্রচারাভিযান চালিয়ে যাবই"

'যতদিন পর্যন্ত না পার্বত চট্টগ্রামকে বেসামরিকীকরণ করা হচ্ছে এবং যতদিন না সকল শরণার্থী তাদের পূর্বপুরুষের জায়গা-জমিতে ফেরত যাচ্ছে ততদিন আমরা প্রচারাভিযান চালিয়ে যাবই''। জাতি সংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের আওতাধীন মানবাধিকার কমিশনের আদিবাসী জাপান বিষয়ক কর্মশালা'র ২৫-২৯শে জুলাই, ১৯৯৪ জেনেভায় অনুষ্ঠিত বাৎসরিক অধিবেশনে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাপান কমিটি' তার লিখিত বিবৃতিকে এ দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে সমাগত বেসরকারী সংস্থা (NGO) সরকারী ও জাতিসংঘের প্রতিনিধিবৃন্দের সম্মুখে ২৮শে জুলাই এই বিবৃতি পাঠ করেন 'শিমিন গাইকৌ কেন্দ্রে'র উপদেষ্টা প্রফেসর তাকিয়াসা তেসিমা।

১৯৯২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত নৃশংস লোগাং গণহত্যার প্রতিবাদ করতে এই সংস্থাটি ১৯৯৩ সালের নভেম্বর মাসে গঠিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সৃষ্ট মানবাধিকার পরিস্থিতির কোন অগ্রগতি না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাপান কমিটিকে জাপানের ১৩০টি বেসরকারী সংস্থা জাতীয় সমন্বয় কারী সংস্থা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। উল্লেখিত বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে জাপান সরকার কর্তৃক বাংলাদেশকে প্রদেয় সরকারী উন্নয়ন সাহায্য (ODA) জুম্ম জনগণকে উৎখাত করতে ও বাঙ্গালী (মুসলিম) সমাজের মূলস্রোতধারার নীচু সামাজিক স্তরে মিশিয়ে দিতে সাহায্য করছে। বিশ্বস্ত-সূত্রে জানা গেছে, অক্টোবর এর পর থেকে এই সংস্থাটি জাপানে সারাদেশ ব্যাপী প্রচারাভিযান শুরুর কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সাংবাদিক সম্মেলন

গত ২৯শে অক্টোবর আগরতলায় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরাস্থ জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতৃবৃন্দ ত্রিপুরা থেকে শরণার্থী প্রত্যাবর্তন বন্ধ রাখার দাবী জানিয়েছেন। সমিতির নেতৃবৃন্দ এ-দাবী জানিয়ে বলেন, গত দুই বৎসর যাবৎ জনসংহতি সমিতির সাথে বাংলাদেশ সরকারের সংলাপ চললেও আলোচনার কোন অগ্রগতি হয়নি। বরং বাংলাদেশ সরকার জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কর্মসূচী অব্যাহত রেখেছে। উভয় পক্ষের সংলাপ ও যুদ্ধ বিরতির সুযোগে বাংলাদেশ সেনা বাহিনী ক্যাম্প স্থাপন ও অপারেশনের মাধ্যমে জুম্ম জনগণের উপর নির্যাতন, হত্যা ও ধর্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনও মুসলমান বাঙালীদের অনুপ্রবেশ ও জমি বেদখল ঘটছে।

সমিতির নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন যে ১৬ দফা উচ্চ প্রস্তাবের ভিত্তিতে জুম্ম শরণার্থীরা দেশে প্রত্যাবর্তন করলেও বাংলাদেশ সরকার প্রতিশ্রুত প্রস্তাবগুলি বাস্তবায়ন করছে না। ফলে প্রত্যাবর্তিত শরণার্থীরা তাদের জমি ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি পাচ্ছে না। সমিতির নেতৃবৃন্দ আরো বলেন যে, গত ২০শে অক্টোবরে বাংলাদেশ সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন কমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। বাংলা-

দেশ সরকারের কাছে প্রেরিত পদত্যাগ পত্রে তিনি অভিযোগ করেন যে, প্রত্যাগত শরণার্থীদের পুর্ণবাসন কর্মসূচী বাংলাদেশ সরকার ঠিকমত বাস্তবায়ন করছে না। ফলে ফিরে আসা শরণার্থীদের মধ্যে প্রায় ৮০ পরিবার এখনও তাদের জমি ফেরত পায়নি। সরকারে প্রতিশ্রুত হালের বলদের টাকাও তাদের দেয়া হয়নি। নেতৃবৃন্দ বলেন-কল্পরঞ্জন চাকমার পদত্যাগই প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশ সরকার শরণার্থীদের পুর্ণবাসন যথাযথ-ভাবে করছে না।

পরিশেষে সমিতির নেতৃবৃন্দ নিম্নোক্ত দাবীসমূহ উত্থাপন করেন। এ দাবীগুলো হচ্ছে—

১। শরণার্থীদের নিরাপদ ও সম্মানজনক প্রত্যাবর্তনের জন্য জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের সফল আলোচনা।

২। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত শরণার্থী প্রত্যাবাসন বন্ধ রাখা।

৩। পার্বত্য চট্টগ্রামে পুর্ণবাসিতদের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সরিয়ে নেয়া।

৪। জাতিসংঘের শরণার্থী হাই কমিশনও আন্তর্জাতিক রেডক্রস সমিতির তত্ত্বাবধানে শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন।

৫। প্রত্যাবর্তিতদের আরো ছয় মাসের রেশন প্রদান।

অমর শহীদের আত্মত্যাগ কখনও বৃথা যায় না

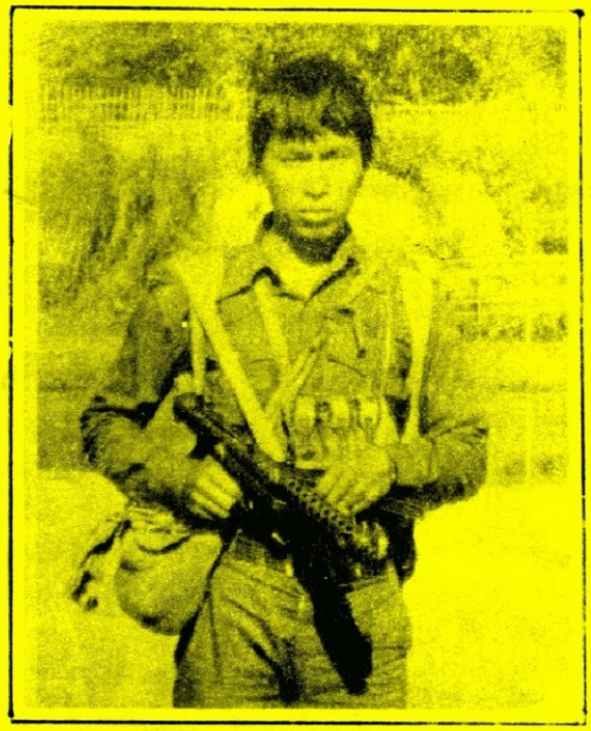

শহীদ পরান চাকমা (জর্জিয়া)

''যতদিন পর্যন্ত না পার্বত্য চট্টগ্রামকে বেসামরিকীকরণ করা হচ্ছে এবং যতদিন না সকল শরণার্থী তাদের পিতৃপুরুষের জায়গা জমিতে ফেরত যাচ্ছে ততদিন আমরা প্রচারাভিযান চালিয়ে যাবো।''

- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাপান কমিটি

''যে যত আদর্শবান সে তত ক্ষমাশীল, ত্যাগী, সাহসী, বিপ্লবী ও দুরদর্শী হতে পারে।''

- এম, এন, লারমা

''জাপান সরকার কর্তৃক বাংলাদেশকে প্রদেয় সরকারী উন্নয়ণ সাহায্য (ODA)) জুম্ম জনগণকে উৎখাত করতে ও বাঙ্গালী (মুসলমান) সমাজের মূলস্রোতধারার নীচু সামাজিক স্তরে মিশিয়ে নিতে সাহায্য করছে।''

- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাপান কমিটি

সম্পাদনা, প্রকাশনা ও প্রচারনা : পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি।